৮

খ্রীষ্টান জগৎ ঃ একটি সমাজের ভিত্তিসমূহ

একাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত

'খ্রীষ্টান জগৎ' কথাটি মধ্যযুগের গোটা সমাজ ও খ্রীষ্টমণ্ডলীর মধ্যকার এক ধরনের সম্পর্ক নির্দেশ ক'রে থাকে। সেই সময় ইউরোপের জাতিসমূহ বিশাল জনসমাজের অংশ ছিল যেখানে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস বন্ধনসূত্রের ভূমিকা পালন করত। খ্রীষ্টমণ্ডলী ও রাষ্ট্র ছিল একই বাস্তবতার দু'টি দিক। আধ্যাত্মিক ও জাগতিক – এ দু'য়ের সমন্বয় ছিল এই বাস্তবতা – অনেকটা মানুষের মধ্যকার দেহ ও আত্মার সমান্তরাল সম্পর্কেরই মত। এই খ্রীষ্টীয় জনসমাজ অর্থ বহন করে শুধু তার অতি প্রাকৃতিক সিদ্ধির মধ্যে অর্থাৎ ঐশরাজ্য। অন্ততঃ এটাই ছিল মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ সময়কার অর্থাৎ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোন কোন ঐশতত্ত্ববিদ কর্তৃক উপস্থাপিত আদর্শ স্বপ্ন।

জার্মান সম্রাটের সঙ্গে প্রায়ই সহিংস লড়াইয়ের মূল্যে এই খ্রীষ্টান-জগতের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল খ্রীষ্টমণ্ডলীতে ও মধ্যযুগীয় ইউরোপে পোপতন্ত্রের ক্রমবর্ধমানহারে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করা। কিন্তু উক্ত দু'শক্তির মধ্যকার ভারসাম্যটা ছিল সর্বদাই ঠুনকো। এয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পোপের ক্ষমতা সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছলেও একই শতাব্দীর শেষ বছরগুলোতে রোমের দাবিগুলো নিয়ে মারাত্মক বিতর্ক সৃষ্টি হয় ও খ্রীষ্টীয় জগতে প্রথম ফাটল দেখা দেয়।

এই অধ্যায়ে সপ্তম গ্রেগরী, সাধু বার্ণার্ড ও সাধু লুইসের যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। উক্ত ব্যক্তিত্রয়ের প্রতি উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কাথলিকরা প্রায়ই অতীত স্মৃতির আকুলতা নিয়ে পিছনে ফিরে তাকায়। এই যুগের কাছ থেকে আমরা অনেক কাথলিক শিক্ষা ও রীতি-নীতি এবং ধর্মীয় শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন লাভ করেছি। তবে আমাদেরকে কোন একটি কালকে আদর্শায়নের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে, কেননা তথাকথিত আদর্শ যুগ খ্রীষ্টমণ্ডলীর সুদীর্ঘ অগ্রগতি পথে একধাপ এগিয়ে যাওয়া বৈ বেশী কিছু নয়। আমরা এমনও দেখতে পাব, মধ্যযুগের খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা মঙ্গলসমাচার সম্মতভাবে সব সময় আচরণ করেনি।

॥১ ॥মধ্যযুগের খ্রীষ্টান-জগতের ভিত্তিসমূহ

১। পোপতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ইউরোপ কিভাবে তুলনামূলক ভারসাম্য অর্জন করেছিল। আমরা এ-ও লক্ষ্য করেছি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা মাণ্ডলিক জীবনের জন্য কয়েকটি দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি ব'য়ে এনেছিল। খ্রীষ্টমণ্ডলীর অনেক নেতা খ্রীষ্টমণ্ডলীকে আরও পবিত্র ক'রে তোলার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং এজন্য সংস্কারসাধনের পন্থা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন বিশেষ ক'রে ৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ক্লুনির উপর নির্ভরশীল মঠগুলোর মত সংস্কার সাধনকৃত মঠগুলো থেকে যাঁরা এসেছিলেন। ধর্মপালকগণ তাঁদের দায়িত্ব পালনে অধিক মনোযোগী হবেন – সংস্কারপন্থীদের এটাই ছিল একান্ত বাসনা। কিন্তু পালকদের মধ্যে অনেকেরই গুণগত মান ছিল নিম্নমানের, কেননা তাঁরা তাঁদের পদ লাভ করেছিলেন রাজরাজাদের কাছ থেকে। ধর্মপালদের, বিশেষ ক'রে প্রধান ধর্মপাল অর্থাৎ রোমের ধর্মপাল নিয়োগের দায়িত্ব থেকে এসব জাগতিক সামন্তরাজদের অব্যাহতি দেয়া দরকার নয় কি?

সংস্কার সংক্রান্ত নির্দেশনামা

[১০২] ১০৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় নিকোলাস পোপ নির্বাচনের নিয়মাবলী নিরূপণ করেন। এই নিয়মাবলী অনুযায়ী পোপ নির্বাচিত হবেন কার্ডিনালগণের দ্বারা। অন্যান্য যাজকগণ ও জনসাধারণকে পোপ পদে নব নির্বাচিত ব্যক্তিটিকে জয়ধ্বনি দিয়ে সংবর্ধনা জানিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সেই সময় থেকে খ্রীষ্টমণ্ডলীতে কার্ডিনালরা বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন। এই কার্ডিনালগণ ছিলেন রোমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উর্ধ্বতন ধর্মযাজক সম্প্রদায়ঃ তাঁরা ছিলেন রোমের চারপাশের এলাকাগুলোর ধর্মপাল, রোমের প্রধান প্রধান গির্জাগুলোর পরিচালকগণ ও প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত সাতজন পরিসেবক। পোপ নির্বাচন করেন এমন একজনের ভূমিকা পালন করা থেকে তাঁকে অব্যাহতি দানকে সম্রাট সহজভাবে নেননি। তাই সংকটকালে কার্ডিনালদের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তির বিপরীতে সম্রাট নিজেই তাঁর পছন্দমাফিক নিজস্ব প্রার্থীকে পোপ হিসাবে বেছে নিতেন।

[১০৩] পোপ সপ্তম গ্রেগরী একটি বিশাল নৈতিক সংস্কারের পরিকল্পনা করেন। ১০৭৪ খ্রীষ্টাব্দের সিদ্ধান্তমালা সিমোনগিরি ও যে সকল ধর্মযাজক বিবাহিত জীবন যাপন করছিলেন, তাদেরকে তীব্র আক্রমণ করে। সেই সময়কার পোপ রাজরাজা ও ধর্মপালগণের সহযোগিতার উপর নির্ভর করতেন, কিন্তু এ সকল সংস্কার সব সময় খুশিমত গৃহীত হয়নি। সপ্তম গ্রেগরী পূতপবিত্রতাকে উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন বটে কিন্তু অনেকেই মনে করত যে সকল ধর্মযাজক তাঁদের অভিষেকের আগেই বিয়ে-সাদি করেছিলেন, তাঁদের ব্যাপারে পোপ সুদীর্ঘকালের সু-প্রতিষ্ঠিত প্রথা পাল্টাতে চাচ্ছেন।

রাজরাজড়া কর্তৃক ধর্মপালদের নিয়োগের বিরুদ্ধে

সাময়িকভাবে নিরুৎসাহিত হয়ে পোপ সপ্তম গ্রেগরী ভাবলেন সকল অনাচারের মূল হচ্ছে রাজরাজাদের কর্তৃক ধর্মপালদের নিয়োগ। সর্বস্তর থেকে তিনি এর অবসান চেয়েছিলেন। ১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহাধর্মপালদেরকে নিষেধ করেন যেন যারা রাজার নিয়োগ গ্রহণ করেছে, তাদেরকে ধর্মপাল পদে নিয়োগ করতে নিষেধ করেন। সপ্তম গ্রেগরী কোন পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভূ-সম্পত্তি ও খোদ পদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। ভূ-সম্পত্তির ব্যাপারটি তাঁর কাছে মোটেও কোন আগ্রহের বিষয় ছিল না। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন ধর্মপাল-পদটি যেন জাগতিক ক্ষমতামুক্ত হয়। এটা ছিল এমন একটি মৌলিক কাঠামোগত ব্যবস্থা, যা কোন কোন ক্ষেত্রে অভিনব কেননা জনসাধারণ আর প্রচলিত
[১০৪] প্রথা অনুসারে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। সেই সঙ্গে dictatus papae (পোপীয় নির্দেশনামা)-এর মাধ্যমে পোপ বিশ্বব্যাপী খ্রীষ্টমণ্ডলীর উপর ও রাজরাজাদের উপর তাঁর কর্তৃত্বের অধিকার সমর্থন করেন। তাঁর সিদ্ধান্তগুলো ঠিকমত পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য তিনি তার প্রতিনিধিদের প্রেরণ করেন।

সংস্কার-সংক্রান্ত নির্দেশনামাসমূহ

[১০২] পোপের নির্বাচন ঃ ১০৫৯ খ্রীষ্টাব্দের নির্দেশনামা (দ্বিতীয় নিকোলাস)

"আমাদের পূর্বসূরীদের দ্বারা ও অন্যান্য পুণ্য পিতৃগণের দ্বারা নির্দেশিত হয়ে আমরা স্থির ও প্রতিষ্ঠিত করেছি যে, রোমের বিশ্বজনীন খ্রীষ্টমণ্ডলীর কোন পোপের মৃত্যুর পর প্রথমে কার্ডিনাল বিশপগণ সমবেত হবেন ও অতি যত্নের সাথে যোগ্যতম ব্যক্তিকে খুঁজে বের করবেন। এরপর তাঁকে অগ্রগণ্য যাজকদের নিকট উপস্থাপন করবেন। অবশেষে, অবশিষ্ট যাজক সম্প্রদায় ও জনসাধারণ এগিয়ে এসে নতুন নিয়োগকে সমর্থন করবে।"

[১০৩] রোম মহাসভার সিদ্ধান্তসমূহ (১০৭৪ খ্রীঃ – সপ্তম গ্রেগরী)

"যে কেউ সিমোনগিরির দ্বারা অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে কোন ধর্মযাজকপদে বা মণ্ডলীর কোন পদে উন্নীত হয়েছে, এখন থেকে সে পবিত্র মণ্ডলীর কোন সেবাদায়িত্ব পালন করতে পারবে না।

যারা অর্থের বিনিময়ে গির্জার দায়িত্ব অধিকার লাভ করে তারা এ সমস্ত গির্জার অধিকার হারাবে। এখন থেকে কেউ গির্জা ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে না।

ব্যভিচারের অপরাধে যারা অপরাধী (বিবাহিত যাজকগণ) তারা খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ কিংবা যজ্ঞবেদীতে নিম্নপর্যায়ের যাজকীয় পদসমূহের দায়িত্ব পালন করতে পারবে না।

আমরা এ-ও স্থির করেছি যে, যারা আমাদের সংবিধানকে – যা স্বয়ং ধর্মাচার্যগণের সংবিধান – নিদারুণ অবজ্ঞা করেছে, তাদের উপাসনায় জনসাধারণ যোগদান করবে না যাতে যারা ঈশ্বরের ভালবাসা কিংবা তাদের সেবাকাজের মর্যাদা কোনটাই সংশোধন করতে পারবে না, তারা যেন মানুষের শ্রদ্ধাবোধের অভাবে ও জনসাধারণের ভর্ৎসনায় লজ্জিত হয়।"

[১০৪] পোপ সপ্তম গ্রেগরীর (১০৭৩–১০৮৫ খ্রীঃ) নির্দেশনামা

২। একমাত্র রোমীয় পোপকেই যথার্থভাবে বিশ্বজনীন বলা যায়।
৩। একমাত্র তিনিই ধর্মপালদের পদচ্যুত করতে বা ক্ষমা দান করতে পারেন।
৯। পোপই হলেন একমাত্র ব্যক্তি যাঁর পা সকল রাজা চুম্বন করবেন।
১২। সম্রাটদের পদচ্যুত করার ক্ষমতা শুধু তাঁরই থাকবে।
১৬। কোন আদেশ ছাড়া কোন সাধারণ ধর্মসভা (মহাসভা) আহ্বান করা যাবে না।
১৮। কেউ তাঁর রায় বাতিল করতে পারবে না; একমাত্র তিনিই রায় বাতিল করতে পারবেন।
১৯। কেউ তাঁর বিচার করতে পারবে না।
২২। রোমীয় মণ্ডলী কখনও ভুল করেনি; শাস্ত্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী সে কোনদিন ভুল করবে না।
২৭। অন্যায়কারী শাসকদের প্রতি প্রজাদের যে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে হয়, তা থেকে পোপ তাদেরকে অব্যাহতি দান করতে পারবেন।

[১০৫] দু'টো তলোয়ার (লুক ২২:৩৫–৩৮ এর উপর ভাষ্য)

আধ্যাত্মিক ও জাগতিক তলোয়ার – উভয় তলোয়ারই খ্রীষ্ট মণ্ডলীর অধিকারে রয়েছে। জাগতিক তলোয়ারটি মণ্ডলীর রক্ষণায় এবং আধ্যাত্মিকটি মণ্ডলী কর্তৃক টেনে বের করতে হবে ঃ আধ্যাত্মিকতাটি যাজকের হাত দ্বারা, জাগতিকটি নাইটের হাত দ্বারা, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই যাজকের নির্দেশে ও সম্রাটের আদেশক্রমে।"

সাধু বার্ণার্ড (১০৯০-১১৫৩), পত্র ২৫৬

রাজরাজড়া কর্তৃক নিয়োগ সংক্রান্ত তর্ক-বিতর্ক

জার্মান সম্রাট চতুর্থ হেনরী পোপের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। কেননা এতে তাঁর দেশে তাঁর কর্তৃত্ব বহুলাংশে খর্ব হয়েছিল যেখানে সবচেয়ে শক্তিশালী সামন্তপ্রভুদের মধ্যে ধর্মপালগণ ছিলেন অন্যতম। ফলে পোপ ও সম্রাটদের মধ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী লড়াই সৃষ্টি হয়। সম্রাট চতুর্থ হেনরী পোপ সপ্তম গ্রেগরীর পদচ্যুতি ঘোষণা করেন। অনুরূপভাবে সপ্তম গ্রেগরীও হেনরীকে পদচ্যুত করেন এবং তাঁর প্রজাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণের দায় থেকে তাদের অব্যাহতি প্রদান করেন। হেনরী শেষ পর্যন্ত তাঁর ক্ষমতা ফিরে পাবার উদ্দেশ্যে ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কানসাতে গ্রেগরীর সামনে নিজেকে নত করতে বাধ্য হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সপ্তম গ্রেগরী ১০৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্বাসনে অবস্থানকালে প্রাণত্যাগ করেন। এরপর সবকিছু ঠিকঠাক হতে কয়েক দশক পার হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ধর্মপাল-পদের ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষমতার মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য করার অনেক চিন্তা-ভাবনা করা হয়। ওয়ার্মস্-এর চুক্তি (১১২২ খ্রীঃ) ও লাটেরান মহাসভার (১১২৩ খ্রীঃ) পর পুনরায় শান্তি ফিরে আসে। ক্রুশ ও আংটির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দান ত্যাগ করেন সম্রাট, কিন্তু একটি যষ্টি দ্বারা তার জাগতিক ক্ষমতাকে ধর্মপালের উপর ন্যস্ত করতে সম্রাটকে অনুমতি প্রদান করেন পোপ। জাগতিক ক্ষমতার ব্যাপারে ধর্মপাল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তাঁর শাসক/রাজা/সম্রাটের প্রতি অনুগত থাকবেন। এরই সঙ্গে সপ্তম গ্রেগরীর ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের সংস্কারসাধনের কাজও সমর্থিত ও অনুমোদিত হয়।

পোপীয় আইনের বিজয়

এই সময় থেকে পোপগণ সংস্কারের কাজে নেমেছেন এবং এই সময় থেকে তাঁরা খ্রীষ্টীয় জগতে প্রতিপত্তি লাভ করেন। মূলতঃ তাঁরাই বিভিন্ন মহাসভা আহ্বানের উদ্যোগ নেন যেখানে ল্যাটিন মণ্ডলীই শুধু জড়িত রয়েছে (১১২৩, ১১৩৯ ও ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দের লাটেরান মহাসভাসমূহ)। বিভিন্ন বিষয়ে পোপগণের সংগৃহীত পত্রাবলী পবিত্র শাস্ত্রের মতই কর্তৃত্বব্যঞ্জক ছিল। এ থেকে বুঝতে পারা যায় পোপের ক্ষমতা জোরদার করার উদ্দেশ্যে নবম শতাব্দীতে রচিত ‘জাল পত্রাবলী’ কেন সফল হয়েছিল। সমগ্র মধ্যযুগে উক্ত পত্রাবলীর কর্তৃত্ব অব্যাহত ছিল। মণ্ডলীর আইন রোমীয় মণ্ডলীর শাসনকার্যে সর্বত্র কার্যকর হয়ে উঠেছিল। পোপগণ গোটা মণ্ডলীর বিভিন্ন ব্যাপারে অধিকতর মাত্রায় হাত
[১০৫] দিতে বাধ্য হন। সাধু বার্ণার্ড তৃতীয় ইউজিন সম্পর্কে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন ঃ ‘কখন আমরা প্রার্থনা করি ? কখন আমরা লোকদের শিক্ষা দিই ? কখন আমরা মণ্ডলীকে বিশ্বাসের আলোকে আলোকিত করি ? প্রতিদিন পোপের রাজপ্রাসাদ জাষ্টিনীয় আইন প্রতিধ্বনিত করে, প্রভু যীশুর আইন নয়।”

পোপ ৩য় ইনোসেন্ট (১১৯৮-১২১৬ খ্রীষ্টাব্দ)

[১০৬] পোপ তৃতীয় ইন্নোসেন্টের (১১৯৮–১২১৬খ্রীঃ) পোপীয় আত্মচেতনা

“খ্রীষ্টমণ্ডলী আমার জন্য এনেছে এক বিশেষ মূল্যবান উপঢৌকন, যথা – আধ্যাত্মিক ক্ষমতার পূর্ণতা ও এক বিপুল ঐশ্বর্যসহ বিস্তর পার্থিব ধন-সম্পত্তি। কেননা অন্যান্য প্রেরিতশিষ্যদেরকে ক্ষমতায় অংশীদার হতে বলা হয়েছে, কিন্তু একমাত্র পিতরকেই ক্ষমতার পূর্ণতা ভোগ করতে আহ্বান জানান হয়েছে। আমার যাজকত্বের জন্য আমি একটি ধর্মপালের টুপি এবং আমার রাজত্বের জন্য একটি মুকুট তাঁর নিকট থেকে লাভ করেছি। আমাকে তাঁর প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যার পরিধেয়ের উপর লেখা রয়েছে ঃ ‘রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু, মেলখিসেদেকের রীতি অনুসারে যাজক তুমি চিরকালের মত’।

চাঁদ যেমন সূর্য হতে তার আলো পেয়ে থাকে, ঠিক তেমনি পোপীয় কর্তৃত্ব থেকেই রাজক্ষমতা মর্যাদার উজ্জ্বলদীপ্তি লাভ ক’রে থাকে।

করুণাময় পিতা পরমেশ্বরের নিকট থেকে আমরা যে ক্ষমতার পূর্ণতা লাভ করেছি, তা প্রথমতঃ তাদের জন্য আমাদের ব্যবহার করতে হয় যাদের প্রতি সদয় আচরণ করা প্রয়োজন।”

ঈশ্বরের শাসন/ঈশ্বরতন্ত্র

সম্রাট ও পোপদের মধ্যে রেষারেষির উদ্ভব কম হত না। জার্মানরাজ রোমীয় আইনকে কাজে লাগাতেন, যে আইনের উপর শিক্ষাগ্রহণ দ্বাদশ শতাব্দীতে পুনরুজ্জীবন লাভ করেছিল। এক অনিশ্চিত সংগ্রামের পর ১১৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ভেনিসে সম্রাট ফ্রেডারিক বার্বারসাকে পোপ তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের নিকট নতিস্বীকার করতে হয়। পোপ তৃতীয় ইন্নোসেন্টের সময় (১১৯৮–১২১৬ খ্রীঃ) পোপতন্ত্র সর্বোচ্চ ক্ষমতার শিখরে আরোহণ করে। পোপ ইউরোপের উপর সর্বনিয়ন্তারূপে আবির্ভূত হন। তিনি তাঁরই প্রার্থীকে সম্রাটরূপে নিয়োগ করতেন, ইংল্যাণ্ডের রাজাকে তাঁর ইচ্ছার কাছে নতিস্বীকার করান। তাঁর হস্তক্ষেপের ভিত্তিতে তিনি পোপীয় ক্ষমতার মতবাদ খাড়া করেন। এটাকেই সময় সময় 'ঈশ্বরতন্ত্র/ঈশ্বরের শাসন' বলে অভিহিত করা হয়েছে। পোপ তৃতীয় ইন্নোসেন্ট দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, তিনি খ্রীষ্টীয় [১০৬] জগতের পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সকল মণ্ডলী তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। জাগতিক ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা বজায় রাখল বটে, কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ের অগ্রগণ্যতার নামে যখন জগতের পাপময়তার দরুণ খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের পরিত্রাণ বিপন্ন হয়ে পড়ত তখন পোপ রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন। স্থানীয় নায়কদের নিমন্ত্রণ করার জন্য যখন কোন সামন্ততান্ত্রিক কর্তা থাকত না, তখন জরুরী অবস্থায় তিনি হস্তক্ষেপ করতেন। চতুর্থ লাটেরান মহাসভা (১২১৫ খ্রীঃ) পোপের আত্ম-মূল্যায়ন ও পোপীয় ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করে ঃ মহাসভা খ্রীষ্টীয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রের বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে।

সংকট ও সংস্কারসাধনের ইচ্ছা

দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের (১২১২–১২৫০ খ্রীঃ) সময়ে সম্রাটের উচ্চাভিলাষের বিরুদ্ধে পোপের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আবারও মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, এই লড়াই তুঙ্গে উঠে যখন পোপ চতুর্থ ইন্নোসেন্ট ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দে লিয়োন্স মহাসভায় সম্রাটকে পদচ্যুত করেন ও অত্যন্ত আপোষহীন পন্থায় ঈশ্বরতন্ত্রের নীতিমালা ঈশ্বরের আসনের পুনর্ব্যক্ত করে। এতে সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে, কিন্তু পোপতন্ত্রও এ থেকে রেহাই পায়নি। কেননা পোপতন্ত্র তখন খুব বেশী মাত্রায় রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল এবং এর নৈতিক কর্তৃত্ব কিছুটা হারিয়ে ফেলেছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে অনেকেই দাবি করছিল যে, খ্রীষ্টমণ্ডলীর সংস্কার সাধিত হওয়া উচিত। বিভিন্ন মাণ্ডলিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুস্পষ্ট অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল ঃ মঠগুলোতে উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভাটা পড়েছিল, এবং কার্ডিনালদের মধ্যে মতানৈক্যের কারণে প্রতিটি পোপীয় নির্বাচনে সমস্যার মাত্রা বেড়েই যাচ্ছিল। আবার মণ্ডলীতে বিভেদ কিছু একটা করার তাগিদ দিচ্ছিল।

১২৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় লিয়োন্স মহাসভা উক্ত সমস্যাগুলোর সমাধানের প্রয়াস পায়। কিন্তু এতে তেমন কোন সুফল লাভ হয়নি। ল্যাটিন ও গ্রীক মণ্ডলীর মধ্যকার পুনর্মিলন ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল, কারণ এর ভিত্তিটা সুচারুভাবে তৈরী করা হয়নি। সংস্কার সাধন খুব সামান্যই অগ্রগতি ব'য়ে এনেছিল। ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কার্ডিনালগণ ভেবেছিলেন পবিত্র আত্মার নির্দেশেই তাঁরা পালন করছেন যখন পোপ (পঞ্চম সেলেষ্টিন) করার জন্য এক আশি বছরের বৃদ্ধ নির্জনবাসী সন্ন্যাসীকে তাঁর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ থেকে বের করে আনেন। এই উদ্যোগ চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছিল।

২। সন্ন্যাসব্রতী খ্রীষ্টমণ্ডলী

মধ্যযুগের খ্রীষ্টমণ্ডলীর জীবনে ও সংস্কার সাধনে সন্ন্যাসব্রতীগণ নির্ধারণী ভূমিকা পালন করেছেন। দীর্ঘকাল ধরে সন্ন্যাসব্রতীগণ খ্রীষ্টীয় আদর্শ তুলে ধরেছেন।

ক্লুনি

৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ক্লুনির ধর্মাশ্রম বেনেডিক্টিয় নিয়মাবলীর মূল নীতিমালা পুনরুজ্জীবিত করে যথা – মঠাধ্যক্ষের স্বাধীন নির্বাচন, রাজরাজড়া ও ধর্মপালদের কবল থেকে নিষ্কৃতি । উপরন্তু, ধর্মাশ্রম পোপের প্রতি তার প্রত্যক্ষ আনুগত্য পুনর্ব্যক্ত করে। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে উক্ত ধর্মাশ্রমটি এমন একটি ধর্মসংঘের প্রধান হয়ে উঠে যা সমগ্র ইউরোপে বিস্তার লাভ করেছিল। বস্তুতঃ আর এটা একটা নতুনত্ব যে পুরনো মঠগুলোর তুলনায় নতুন স্থাপিত

[১০৭] ধর্মযাজক ও বিবাহ

নতুন নিয়ম

পল মঙ্গলসমাচার প্রচারকাজে অধিকতর আত্মনিবেদিত হবার উদ্দেশ্যে বিয়ে-থা করবেন না বলে স্থির করেছিলেন (১করি ৭:৭; ৯:৫), কিন্তু এটাকে তিনি কোন সার্বজনীন নিয়ম করেননি। খ্রীষ্টমণ্ডলীর কোন সেবাকর্মীর বিবাহ সম্পর্কে শাস্ত্রে একটিমাত্র নির্দেশ পাওয়া যায় ১তিমথি ৩:২; তীত ১:৬ অংশগুলোতে ঃ "ধর্মপাল হবেন এমনই মানুষ, যিনি একবারের বেশী দু'বার বিয়ে করেননি।" পিতৃগণের শিক্ষায় এই অনুচ্ছেদ দু'বার বিয়ে করেছেন এমন কোন পুরুষকে ধর্মযাজকদের পদে অভিষিক্ত করার বিরুদ্ধে একটি নিষেধাজ্ঞারূপে এবং বিপত্নীক কোন ধর্মযাজকের পুনরায় বিয়ে করার বিরুদ্ধে একটি নিষেধাজ্ঞারূপে ব্যাখ্যা করা হত। কেউ কেউ মনে করতেন যে, ধর্মপালদের বিয়ে করা একটি নৈতিক বা আইনগত বাধ্যবাধকতা।

প্রথম তিন শতাব্দী

প্রাচ্যের বা পাশ্চাত্যের কোন আইনই বিবাহিত পুরুষদের অভিষেক নিষিদ্ধ করেনি কিংবা বিবাহিত যাজকদের যৌন সংসর্গ থেকে বিরত থাকাকে আবশ্যক করেনি। তদ্রূপ, অভিষেকের সময় অবিবাহিত ছিলেন এমন কোন যাজক যদি পরে বিয়ে করতেন, তাহলে এতে কোন আপত্তি করা হত বলে মনে হয় না। তবে, কৃচ্ছ্রব্রত বা কঠোর তপশ্চর্যা ও কৌমার্যের প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছিল তা থেকে বুঝা যায় কোন যাজকের পক্ষে অবিবাহিত থাকা কিংবা তিনি বিবাহিত হলে যৌন সংসর্গ থেকে বিরত থাকাটা তাঁর জন্য অধিকতর শ্রেয় মনে করা হত।

চতুর্থ শতাব্দী

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জগতে অভিষেকের পর যাজকদের জন্য বিয়ে করা নিষিদ্ধ করা হয়। কেউ বিবাহিত হলে অভিষেকের পরও তা-ই থাকত। অবিবাহিত ব্যক্তি অবিবাহিতই থাকত। প্রত্যেকেই বিবাহ হোক বা অভিষেক হোক যে প্রথম বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে তার প্রতি চির বিশ্বস্ত থাকবে।

শতাব্দীর শুরুতে যাজকদের অধিকাংশই তাঁদের বৈবাহিক অধিকার প্রয়োগ করতেন। শতাব্দীর শেষ দিকে এসে যৌন সংসর্গ থেকে বিরত থাকেন এমন যাজকদের সংখ্যাই বেশী হয়ে উঠে। আমরা এর দু'টি ব্যাখ্যা পাই ঃ ঈশ্বরের সেবায় অধিকতর আত্মনিয়োগ, এবং প্রত্যহ খ্রীষ্টযাগ অনুষ্ঠানের সঙ্গে যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়া সঙ্গতিহীন, কেননা যৌনক্রিয়াকে অশুচি ভাবা হত।

পাশ্চাত্যে (স্পেন ও রোমে) বিভিন্ন মহাসভা ধর্মপাল, যাজক ও পরিসেবকদের দাম্পত্য সংযম অপরিহার্য ক'রে তুলে।

পঞ্চম শতাব্দী

প্রাচ্যে ধর্মপাল, যাজক ও পরিসেবকগণ তখনও বিয়ে করতে পারতেন। পাশ্চাত্যে রোমের ধর্মপাল সকল মণ্ডলীকে নির্দেশ দেন যেন তারা ধর্মপাল, যাজক ও পরিসেবকদের কাছে দাম্পত্য সংযম দাবি করেন, কিন্তু তাঁরা তাঁদের পত্নীর সঙ্গে একত্রে বাস করতে পারতেন।

ষষ্ঠ শতাব্দী

প্রাচ্যে খ্রীষ্টমণ্ডলী অবশেষে যাজকসম্প্রদায় ও বিবাহ বিষয়ক নিয়ম স্থির করতে সক্ষম হয় (৬৯২ খ্রীঃ)। সেই নিয়ম আজও বহাল আছে। ধর্মপালরূপে মনোনীত হয়েছেন এমন কোন বিবাহিত পুরুষকে অবশ্যই তাঁর স্ত্রী থেকে পৃথক হতে হবে। স্ত্রীকে তাঁর বাড়ী-ঘর ছেড়ে দূরে কোন মঠে গিয়ে বাস করতে হবে। ধর্মপাল অবশ্যই তাঁর স্ত্রীর ভরণপোষণ করবেন। তবে ক্রমেই অধিক সংখ্যায় ধর্মপালদের বেছে নেয়া হয়েছিল সন্ন্যাসীদের মধ্য থেকে।

যে সকল যাজক ও পরিসেবক তাঁদের অভিষেকের সময় বিবাহিত ছিলেন, তাঁরা কোনভাবেই তাঁদের বিবাহিত জীবন পরিবর্তন করতেন না। তবে এই প্রথার ব্যতিক্রমকেও নিন্দা করা হত।

পাশ্চাত্যে যাজকদের বৈবাহিক সংযমকে জোরদার করা হয় ঃ একটি মহাসভা যাজকদের শয়নকক্ষে নৈশপ্রহরী রাখার প্রথা পর্যন্ত প্রচলন করতে চেয়েছিল। অভিষেকের পর কোন ধর্মযাজকের কোন সন্তান হলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হত।

শার্লেমেন থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত

স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস করেও যে সকল বিবাহিত পুরুষ দাম্পত্য সংযম অনুশীলন করত, তাদেরকেও অভিষিক্ত করা হত। তবে শিক্ষালয়ে প্রশিক্ষিত অবিবাহিত যুবক যাজকদের অবিবাহিত অবস্থায় যাজকপদে অভিষিক্ত করা হত। নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ অভিষেকের পরও বিয়ে করত। ১০৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম গ্রেগরী এ রকম পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হয়েছিলেন।

গ্রেগরীর সংস্কার

১০৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম গ্রেগরী – অভিষেকের আগে বিবাহিত যাজক ও অভিষেকের পর বিবাহিত যাজকদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। যেকোন ধরনের একত্রে বসবাস করা নিষিদ্ধ অন্যথায় তাদের সেবাদায়িত্ব থেকে বঞ্চিত হবেন। পোপীয় এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতাও করা হয় ঃ "এই আইন অসহনীয় ও অযৌক্তিক।" "মহিলাদের হাতের সেবা ব্যতীত আমরা ঠাণ্ডায় ও বস্ত্রহীনতায় মারাই পড়ব ..." কেউ কেউ এই আইনকে ঐতিহ্যের সঙ্গে তুলনায় একটি অভিনব আইন ব'লে গণ্য করেছেন। তবে, যদিও তা ছিল অবৈধ, তথাপি যাজকদের বিবাহ আইনসম্মত বলে বিবেচিত হত।

দ্বিতীয় লাতেরান মহাসভা (১১৩৯ খ্রীঃ)

এই মহাসভায় স্থির করা হয় যে, যাজকদের বিবাহ আইনসিদ্ধ নয়। পোপ তৃতীয় আলেকজাণ্ডার নিয়ম করেন যে, বিবাহিত কোন পুরুষকে যাজকপদে অভিষিক্ত হতে হলে এতে তাঁর স্ত্রীর সম্মতি থাকতে হবে এবং তাঁর স্ত্রীকে শুচিতা ব্রত গ্রহণ করতে হবে।

কোন বিবাহিত পুরুষ তাঁর স্ত্রীকে ছেড়ে এলে তাকে অভিষিক্ত করা আইনতঃ তখনও সম্ভব ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা ছিল খুবই কঠিন; যাজকত্ব কার্যতঃ কুমার-ব্রতী ও বিপত্নীকদের জন্য সীমাবদ্ধ করা হয়। তবে অনেক পরে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের খ্রীষ্টমণ্ডলীর আইন-সংহিতায় শুধু এই কথাই বলা হত যে, যাজকীয় অভিষেকের জন্য বিবাহ একটি বাধা আর তাই মাণ্ডলিক কৌমার্যের নিয়ম সুনির্দিষ্টভাবে আরোপ করা হোক।

এম. দর্তেল-ক্লাউদো, Etat de vie et rôle due prêtre, প্যারিস ১৯৭১, ৪৩-৯০

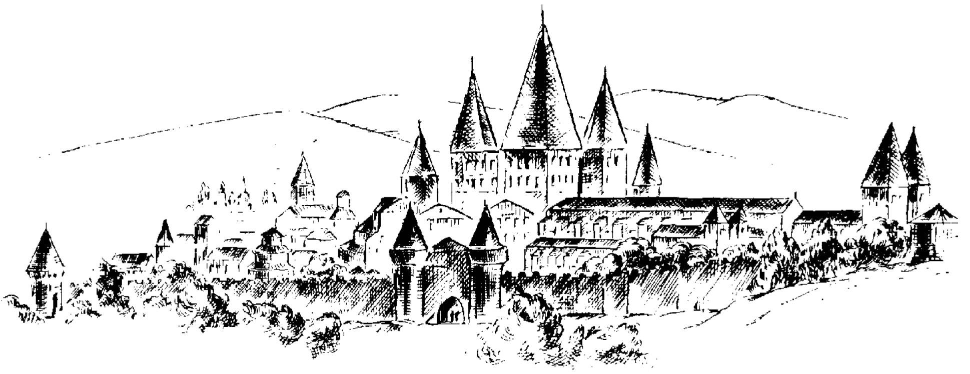

ক্লুনির মঠ (অষ্টাদশ শতাব্দীর খোদাইকার্যের পর)

মঠগুলো কিন্তু ক্লুনির মঠাধ্যক্ষের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। এর স্বর্ণযুগে 'ক্লুনির রাজ্যে' ৫০,০০০ সন্ন্যাসী ছিল।

ক্লুনি মঠের কায়িক পরিশ্রমের উপর কম গুরুত্ব দিয়ে উপাসনা ও অবিরত প্রার্থনার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। ক্লুনির মাজলুস, (৯৪৮–৯৯৪ খ্রীঃ) ওদিলো (৯৯৪–১০৫৯ খ্রীঃ), হাগ (১০৪৯–১১০৯ খ্রীঃ) ও মান্যবর পিটার (১১২২–১১৫৬ খ্রীঃ) প্রমুখ আদি মঠাধ্যক্ষগণের ব্যক্তিত্ব ও দীর্ঘায়ু একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ক্লুনির প্রভাব-প্রতিপত্তিতে যথেষ্ট ইন্ধন যুগিয়েছিল। অন্যান্য মঠের সংস্কারে ও খ্রীষ্টমণ্ডলীর সার্বিক সংস্কারে ক্লুনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। কোনরকম জাগতিক লাভের আশা না করে উক্ত ধর্মসংঘটি পোপতন্ত্রের ভূমিকা সমর্থন ও রক্ষা করে এবং খ্রীষ্টমণ্ডলীর সেবায় অনেক ধর্মপাল ও পোপ দান করে। ধর্মাশ্রমটি দরিদ্রদের সেবায়ও উদার ছিল। রোমেনেস্ক শিল্পকলা ও স্থাপত্যরীতি বিস্তারে ইহা বিশেষ অবদান রেখেছিল ঃ ক্লুনির গীর্জাটি দীর্ঘকাল ধরে ইউরোপের বৃহত্তম গীর্জা ছিল। ক্লুনি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের আশেপাশের অন্যান্য দালান-কোঠার সমাবেশকে আকৃষ্ট করে। ক্লুনির সমসাময়িক অন্যান্য বেনেডিক্টিয় ধর্মাশ্রমগুলো তাদের এলাকাসমূহে যেমন – অভারগ্নের লা শেই-দিউ, মার্সেই-এর সেন্ট ভিক্টর, তাসকানিতে সাধু রোমাউয়াল্ড কর্তৃক স্থাপিত কামালডলিতে প্রভাব ফেলেছিল।

মরুবাসী সন্ন্যাসীগণ

একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মরুবাসী সন্ন্যাসীদের একটি প্রবল আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। প্রায়শ্চিত্ত ও দরিদ্রতার বাসনায় আবিষ্ট হয়ে অনেক নারী-পুরুষ তাদের পাপের ক্ষতিপূরণার্থে বনবাদাড়, গুহা, গভীর সংকীর্ণ উপত্যকা, দ্বীপ ইত্যাদির ন্যায় 'ভয়ানক' স্থানে আশ্রয় নেয়। কিন্তু তাঁদের সাধুতার সুখ্যাতিই মানুষকে বেশী আকৃষ্ট করেছে, এবং এতে তাঁরা হয়ে উঠতেন জনপ্রিয় প্রচারক। মরুবাসী সন্ন্যাসী পিটার সর্বাধিক পরিচিত হলেও আর্‌ব্রিসেলের রবার্টের (১০৪৫–১১১৬ খ্রীঃ) কার্যাবলী সর্বাধিক সুদূর-প্রসারী ফল ফলিয়ে। লয়রে উপত্যকায় ফন্টেভ্রল্ট-এ মহিলাদের ধর্মসমাজ ও পুরুষদের ধর্মসমাজরূপে তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের প্রতিষ্ঠিত করেন। তবে সন্ন্যাসব্রতিনীদের ধর্মাধ্যক্ষা বিভিন্ন মঠের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার ছিল।

মধ্যযুগ সেই অদ্ভুত ধরনের ধর্মীয় জীবন, সেই একান্তবাসীর বা নির্জনবাসী সন্ন্যাসীর জীবন প্রত্যক্ষ করেছে। গীর্জার পাশে নির্মিত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ বা খুপড়ীর মধ্যে নর-নারীগণ সারাজীবনের জন্য নিজেদের আবদ্ধ করে রাখতেন। প্রকোষ্ঠের ছোট্ট জানালাগুলো তাদেরকে মাত্র প্রাহরিক প্রার্থনার শব্দ শোনার ও খাদ্য গ্রহণের সুযোগ দিত।

লা শারত্রেস (La Chartreuse)

১০৮৪ খ্রীষ্টাব্দে লা শারত্রেস প্রতিষ্ঠা ক'রে ব্রুনো নিঃসঙ্গ জীবন ও সংঘবদ্ধ জীবনকে একত্র করতে চেয়েছিলেন। [১০৮]
তিনি নির্জনতা ও ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের অকপটতাকে উচ্চাসন দিয়েছিলেন।

মঠবাসী যাজক

মঠবাসী যাজকগণ সাধু আগষ্টিনের নিয়মাবলীকে গ্রহণ ক'রে সেবাদায়িত্ব পালনের কৃচ্ছ্রসাধনায় সন্ন্যাসজীবনের সমন্বয়

ইউরোপের মঠজীবনের ক্ষেত্রসমূহ

▲ ক্লুনি এবং এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ১১০৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্লুনি সম্প্রদায় ১১৮৪ টি মঠ নিয়ে গঠিত ছিল যার মধ্যে ৮৮৩ টি ছিল ফ্রান্সে।

■ সিট্যু এবং এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এবং মঠসংখ্যা ছিল ৬৯৪ টি

● অন্যান্য মঠসমূহ

ঘটিয়েছিলেন। ১১২৬ খ্রীষ্টাব্দে নর্বার্ট্ কর্তৃক স্থাপিত প্রেমনস্টাটেনসীয়গণ এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিচিতি পেয়েছিলেন।

সিট্য্য

১০৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে মলেস্‌মসের রবার্ট বেনেডিক্টের কৃচ্ছ্রসাধনা পুনরায় ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট [১০৯]
হয়েছিলেন যার কথা ক্লুনি মনে হয় ভুলে গিয়েছিল।

পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার ও বাসভবনের দীনতায়, সহজ-সরল উপাসনা ও বন-জঙ্গলের নির্জনতায় প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল। সিষ্টারসীয়গণ ভূমি পরিষ্কার কাজে সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। নতুন এই ধর্মসংঘটি ক্লুনির মত ছিল না – এর মঠাধ্যক্ষের অন্য সব প্রতিষ্ঠানের উপর কর্তৃত্ব ছিল না। জেনারেল চ্যাপ্টারে অর্থাৎ মঠাধ্যক্ষদের বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করা নিয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হত।

ক্লেয়ারভ ও সাধু বার্ণার্ড

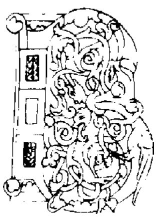

ইংরেজী 'B' অক্ষর। ক্লেয়ারভ-র প্রার্থনা-সঙ্গীতের আদ্যাক্ষর।

১১১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত ক্লেয়ারভর ধর্মাশ্রম থেকে বার্ণার্ড (১০৯০–১১৫৩ খ্রী:) সিষ্টারসীয় ধর্মসংঘের ক্রমবিকাশে যথেষ্ট অবদান রাখেন। তিনি নিজে ৬৬টি ধর্মাশ্রম স্থাপন করেন। সাধু বার্ণার্ডের তৎপরতা ক্লেয়ারভ-এর গণ্ডী ছাড়িয়ে গিয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তিনি ছিলেন খ্রীষ্টমণ্ডলীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। প্রায়শঃ তিনি তাঁর ধর্মাশ্রমের বাইরেও বহু ভিন্নমুখী বিষয়ে জড়িত ছিলেন। যাজকদের সংস্কারের পক্ষে তিনি কাজ ক'রে গেছেন। তিনি ক্লুনির শৈথিল্যে ক্ষুব্ধ হন। দীনতা অনুশীলন করতে ও গরীবদের প্রতি দরদী হতে তিনি ধর্মপালদের উৎসাহিত করেন। তিনি রোমের খ্রীষ্টমণ্ডলীর ধর্মবিচ্ছেদের অবসান ঘটান। ক্লেয়ারভ-এর একজন সন্ন্যাসী – যাকে ১১৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় ইউজিনিউ নামে পোপ করা হয়েছিল

[১০৮] লা গ্র্যাণ্ড শারত্রেস প্রতিষ্ঠা (১০৮৪ খ্রীঃ)

ব্রুনো জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কচ্ছেদ করার মানসে রেইমস্ নগরী ত্যাগ ক'রে এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে মেলামেশা তাঁর কাছে অপছন্দ মনে হলে তিনি তাদের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে গ্রেনভল জেলায় চলে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁর বাসস্থানের জন্য বেছে নেন অত্যন্ত খাড়া পিঠিযুক্ত ও ভীষণ ভয়ঙ্কর একটি পার্বত্য চূড়া যেখানে গিয়ে পৌঁছতে হত খুবই কষ্টে ও দুর্গম পথে। এর নীচে উঁচু খাড়া পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি উপত্যকা ছিল। সেখানেই তিনি তাঁর সন্ন্যাস জীবনের নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানেই তাঁর অনুসারীগণ আজও বসবাস করছে।

পর্বতের পাদদেশ হতে সেখানকার গীর্জাটি খুব বেশী দূরে নয়। এর রয়েছে কিছুটা তরঙ্গের মতো উঁচু-নীচু ছাদ। সেখানে ১৩ জন সন্ন্যাসী বাস করেন; তাঁদের রয়েছে একটি ধ্যানাশ্রম/নির্জন মঠ যা সমাজবদ্ধ জীবনযাপনের খুবই উপযোগী হত; কিন্তু তারা অন্যান্য কঠোর সন্ন্যাসব্রতীদের মত ধ্যানাশ্রমে সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন করেন না। ধ্যানাশ্রমের চারদিকে প্রত্যেকেরই তার নিজস্ব কুঠরী রয়েছে ঃ তারা সেখানেই খায়-দায়, ঘুমায় ও কাজ করে। রবিবার দিন তাদের প্রত্যেকে খাদ্য পরিবেশনকারীর নিকট হতে তার খাদ্য যথা – রুটি ও শাক-সব্জী গ্রহণ করে। তারা এই আকর্ষণীয় খাদ্য তাদের কুঠরীতেই রান্না ক'রে থাকে।

তারা যে জল পান করে ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করে, তা জল নিষ্কাশনের নালা দিয়ে একটি ঝরণা থেকে এসে থাকে। উক্ত জল বিশেষভাবে নির্মিত নালার মধ্য দিয়ে প্রতিটি কুঠরীতে চলে গেছে। রবিবার ও অন্যান্য পর্বদিনে তাদের খাদ্য হচ্ছে মাছ ও পনির।

আমরা যে সময় গীর্জায় যেতে অভ্যস্ত, তারা কিন্তু তখন গীর্জায় যায় না, কিন্তু বিশেষ কয়েকটি প্রহরেই সেখানে যায়। রবিবার ও অন্যান্য বড় বড় পর্বদিন তাঁরা খ্রীষ্টযাগে যোগদান করে। তারা একরকম কথা বলে না বললেই চলে। যদি তাদের কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তখন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশ করে। তাঁরা একজন উপ-মঠাধ্যক্ষের অধীনে থাকে। তবে গ্রেনভলের ধর্মপাল, যিনি একজন ধর্মপরায়ণ মানুষ, তিনিই মঠপ্রধান ও পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন ক'রে থাকেন।

তাঁরা দরিদ্র জীবন-যাপন করলেও তাদের খুবই সমৃদ্ধ লাইব্রেরীতে রয়েছে প্রচুর বইপত্রের সমারোহ ...।

জায়গাটিকে বলা হয় লা শারত্রেস। খাদ্যশস্য উৎপন্ন করার জন্য তারা বেশী চাষাবাদ করে না। কিন্তু তারা বিপুল সংখ্যক মেষ পালন করে ব'লে মেষের লোমের বিনিময়ে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহের প্রথা রয়েছে।

নজেনের গিলবার্ট, নির্জনবাসী সন্ন্যাসী (১০৫৩-১১২৪)

– জীবন-বিধান তৈরী ক'রে দেন। বার্ণার্ড সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে খ্রীষ্টীয় ভাবধারাপুষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলেন ঃ তিনি সামন্তরাজদের ব্যয়বহুল জীবনধারা কঠোর সমালোচনা করেন ও বিবাহের পবিত্রতা ঘোষণা করেন। ভেজেলে ও স্পিরে (১১৪৬ খ্রীঃ) দ্বিতীয় ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ বিষয়ক প্রচারকরূপে তিনি ইহুদী নিধনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে চেষ্টা করেন, কেননা কিছু সংখ্যক গোঁড়াপন্থী ইহুদী নিধনকে তাদের ক্রুসেডের অংশ ক'রে নিয়েছিল।

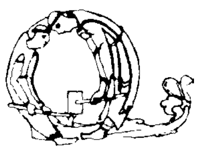

ইংরেজী অক্ষর 'Q'। সিষ্টারসীয় পাণ্ডুলিপির আদ্যাক্ষর

তা সত্ত্বেও,সামন্ততান্ত্রিক বীরধর্ম ও সন্ন্যাসজীবনের আদর্শ দ্বারা বিশিষ্ট হিসাবে প্রতিপন্ন বার্ণার্ড সব সময় ঠিকমত বুঝে উঠতে পারেননি তাঁর যুগ কিভাবে এগিয়ে চলছিল। সামন্তরাজ ও ধর্মপালদের বিরুদ্ধে বর্ধিষ্ণু শহরগুলোর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দাবিসমূহ তাঁর কাছে প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষ্যে পরিচালিত একটি আঘাত ব'লে মনে হয়েছিল। অধিক থেকে অধিকতর পরিমাণে বার্ণাড ক্রমবর্ধমান সংখ্যক ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে ধর্মবিশ্বাস রক্ষা করেন বটে, কিন্তু আবেলার্ডকে (১১৪০ খ্রীঃ) নির্যাতন ও দোষী সাব্যস্ত ক'রে তিনি ঐশতাত্ত্বিক চিন্তাধারার গতি কিছুটা রোধ করেছিলেন।

নিঃসন্দেহে বার্ণার্ড ছিলেন সর্বাগ্রে একজন আধ্যাত্মিক গুরু। তিনি ছিলেন খ্রীষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণের মধ্যে সর্বশেষ ধর্মাচার্য, এমন এক মানুষ যাঁর কাছে পবিত্র শাস্ত্র ধ্যানই ছিল সবকিছুর সূচনা-বিন্দু। বার্ণার্ড কৃচ্ছ্রসাধনা ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের চেয়ে বরঞ্চ ঈশ্বরেরসঙ্গে একাত্মতার উপর বেশী জোর দিয়েছিলেন এবং শিক্ষা দিতেন যে, গোটা ধর্মের মূল সাধনা হল প্রেম-ভক্তি অনুশীলন করা। তিনি ঈশ্বর-সান্নিধ্যে ফিরে যাওয়ার একটি পন্থার প্রস্তাব ক'রে গেছেন যা মানুষকে আত্মজ্ঞান থেকে ঈশ্বরকে আবিষ্কার করার পথে নিয়ে যায়। বাইবেলের পরম গীতের উপর তাঁর ধর্মোপদেশগুলো তাঁর ধর্মীয় রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

[১০৯] সিট্যু বা 'নতুন মঠাশ্রম'

মঠাধ্যক্ষ অব্রি [১] ও তাঁর ভ্রাতৃগণ তাঁদের প্রতিজ্ঞার কথায় বিস্মৃত না হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করেন এই স্থানে সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম প্রতিষ্ঠা করবেন এবং যা এই নিয়মের পরিপন্থী তা পরিত্যাগ করবেন, যথা – আলখাল্লা ও লোমশ চামড়ার কোট, শার্ট ও মস্তকাবরণ, বিছানার চাদর ও খানাঘরে বিচিত্র খাবার-দাবার, চর্বিযুক্ত খাবার এবং নিয়মের বিশুদ্ধতার পরিপন্থী সবই বাদ দিয়ে উক্ত নিয়ম প্রয়োগ করবেন।

আর যেহেতু সাধু বেনেডিক্টের জীবনের নিয়ম-কানুন পাঠ ক'রে তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে, এই মহাচার্যের কোন গীর্জা ছিল না বা যজ্ঞবেদীও ছিল না অথবা নৈবেদ্য বা সমাধিস্থান কিংবা অন্য লোকদের কাছ থেকে পাওয়া দান ছিল না কিংবা চূলা, কল অথবা জমি চাষ করার মানুষ বা গ্রাম ছিল না; তাঁর মঠাশ্রমে মহিলা প্রবেশ করেনি এবং তিনি তাঁর বোনকে ব্যতীত অন্য কাউকে সমাধিস্থ করেননি, তাই তারা এসব পরিত্যাগ করলেন ...

এই যুগের ধন-সম্পদের প্রতি বিরাগে পূর্ণ হয়ে দীনহীন খ্রীষ্টের ন্যায় দীনদরিদ্র খ্রীষ্টের নতুন সৈন্যেরা খতিয়ে দেখতে শুরু করলেন কী পন্থায়, কী পদ্ধতিতে, কোন্ রীতিতে এ জীবনে তাদের নিজের অস্তিত্বকে এবং অতিথি, ধনী-গরীব যারা তাঁদের নিকট আসে এবং তাঁদের নিয়ম মোতাবেক যাদেরকে স্বয়ং খ্রীষ্ট ভেবে সাদরে গ্রহণ করতে হয়, তাদের সকলের অস্তিত্বকে নিশ্চিত করতে পারেন। তারপর তাঁদের ধর্মপালের অনুমতি নিয়ে তাঁর শ্মশ্রুবিশিষ্ট অযাজকীয় ব্রাদারদের গ্রহণ করার এবং সন্ন্যাস-জীবনে ছাড়া জীবনে-মরণে তাদের আপনজন বলে গণ্য করার সিদ্ধান্ত নেন। তারা ভাড়ায় শ্রমিক নিয়োগ করবেন স্থির করেন, কেননা এসব লোকের সহায়তা ব্যতীত তাঁরা ভাবতেই পারতেন না কি ক'রে তাঁরা তাঁদের নিয়মের বিধানাবলী দিন-রাত পুরোপুরি সম্পন্ন করতে পারবেন।

এ সকল পুণ্যাত্মাগণ জানতেন যে, ধন্য বেনেডিক্ট তাঁর মঠগুলো নির্মাণ করেছিলেন শহর, দুর্গ বা গ্রামাঞ্চলে নয়, কিন্তু লোকারণ্য থেকে দূরবর্তী স্থানগুলোতে, তাই তাঁরাও তাঁর অনুকরণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। আর যেহেতু এই মানুষটি এটা আবশ্যক করেছিলেন যে, মঠাশ্রমগুলোতে ১২জন সন্ন্যাসব্রতী ও একজন মঠাধ্যক্ষ থাকবেন, তাই তাঁরাও এই প্রথা পালন করতে শুরু করেছিলেন।

'ভালবাসার সনদ' সিট্যুর জন্য সর্বপ্রথম নিয়ম-কানুন প্রণয়ন, আনুমানিক ১১১৮ খ্রীঃ

---

১ - অব্রি ছিলেন সিট্যুর দ্বিতীয় মঠাধ্যক্ষ (১০৯৮–১১০৮ খ্রীঃ)

॥২॥ বিশ্বাসের কাজ-কর্ম

১। মঠজীবনের ধর্ম ও লৌকিক ধর্ম

ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা ও মানবত্ব

মধ্যযুগের ধর্ম গ্রামীণ ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অনেক দিক ধারণ করেছিল। সামন্ততান্ত্রিক ক্রমবিন্যাসের শীর্ষে পরম প্রভুরূপে ছিলেন ঈশ্বর। আর জাগতিক রাজ-রাজড়া হলেন শুধু তাঁরই জায়গীরদার ও সেবক। এই শক্তিমান ঈশ্বরকে যতটা না ভালবাসা হত তার চেয়ে বেশী ভয় করা হত। তিনি ছিলেন সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণের বিধানকারী। যত সফলতা ও বিফলতা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীকে বিধাতার প্রতি আরোপ করা হত। তবে মঙ্গলবার্তা প্রচার আন্দোলনসমূহ যীশুর মধ্যে ঈশ্বরের মানবত্বকে অধিক থেকে অধিকতর জোর দিতে থাকে। পুণ্যভূমিতে তীর্থযাত্রা ও ফ্রান্সিসকান জীবন-পদ্ধতি এরই সাক্ষ্য বহন করে।

খ্রীষ্টীয় আদর্শ ঃ নির্জনবাসী সন্ন্যাসী

এমনই এক যুগে যখন যাজকগণ ছিলেন একমাত্র লোক যারা লিখিত বাণী মারফতে নিজেদের ব্যক্ত করতেন, তখন খ্রীষ্টীয় আদর্শের ধারক ও বাহক ছিলেন নির্জনবাসী সন্ন্যাসী। সাধু-সাধ্বীদের পঞ্জিকা ধর্মপাল, নির্জনবাসী সন্ন্যাসী ও অন্যান্য সন্ন্যাসব্রতীদের ছাড়া অন্য কাউকে স্বীকৃতি দিত না বললেই চলে। সেখানে বড় জোর এমন রাজকন্যার স্থান থাকত যিনি বিয়ের পর অতি শীঘ্রই বিধবা হলে জীবনের বাকী দিনগুলো কাটান প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ও গরীব-দুঃখীদের প্রতি সৎকাজ ক'রে। সাধু বার্ণাড জগৎ-সংসারকে একটি বিশাল সাগরের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন যে সাগরকে পরিত্রাণ লাভের আগে অতিক্রম করতে হত। নির্জনবাসী সন্ন্যাসীগণ সেই সাগর পার হতে যেয়ে ভিজতেন না, কেননা তাঁর সাগর পার হতেন একটি পুল দিয়ে। কর্মযোগী ধর্মযাজকগণ সাধু পিতরের নৌকা ব্যবহার করতেন। কিন্তু হতভাগ্য বিবাহিত লোকদেরকে সাঁতরিয়ে সাগর পার হতে হত এবং তা করতে গিয়ে অনেকে ডুবে মরত। সন্ন্যাসব্রতী হতে না পেরে ধর্মপরায়ন ভক্ত-সাধারণ সন্ন্যাসজীবনের কিছুটা অনুসরণ করতে চেষ্টা করেন। সাধু লুইস প্রাহরিক প্রার্থনাগুলো আবৃত্তি করতেন, রাত্রি দ্বিপ্রাহরিক প্রার্থনার জন্য রাতে ঘুম থেকে জাগতেন, এবং অনেক ত্যাগস্বীকার করতেন। ভক্ত-সাধারণের অনেকেই মৃত্যুর সময় এই মর্মে নির্দেশ দিয়ে যেতেন যে, মৃত্যুর পর যেন তাদেরকে সন্ন্যাসীর পোশাকে সমাহিত করা হয়।

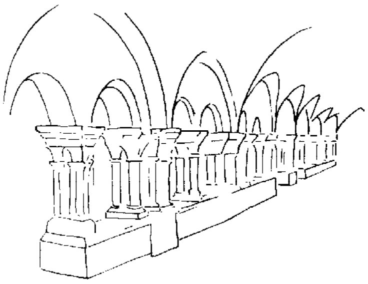

ফন্টেনের মঠের গলিপথ

ধর্ম যেমনটা যাপিত হত

তবে, এতে একটা ভুল ধারণার জন্ম দিতে পারে যে, উক্ত সুন্দর দৃষ্টান্তগুলো দেখে মনে করতাম সাধারণ মানুষের খ্রীষ্টীয় জীবন ঠিক এরকম। ইউরোপের লোকমাত্রেই ছিল খ্রীষ্টান, কিন্তু তা ছিল আমাদের ধর্ম থেকে এক ভিন্ন খ্রীষ্টধর্ম। ভিন্ন মতালম্বী কিছু আন্দোলন মধ্যযুগে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছিল যা শান্তসমাহিত ঐকমত্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না এবং যার বিষয়ে গত শতাব্দীর ঐতিহাসিকগণ তাদের বক্তব্য রেখেছেন। ঐশতত্ত্ববিদগণের সুন্দর সুন্দর তন্ত্র/পদ্ধতি এবং মহামারী ও বিরূপ আবহাওয়ার বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামকারী হতাশাগ্রস্ত ও নিরক্ষর গ্রামাঞ্চলের মানুষের ধর্মের মধ্যে একটি বিরাট পার্থক্য ছিল।

খ্রীষ্টধর্ম এক ধর্মীয় অতীতকে, প্রকৃতির জীবন ও ঋতুচক্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রাক-খ্রীষ্টীয় ধর্মকে পুরোপুরি আত্মীভূত ক'রে নিয়েছিল। উপাসনা বর্ষ-চক্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে খ্রীষ্টবিশ্বাসী মাত্রই তাঁর পরিত্রাণের প্রধান প্রধান পর্যায়গুলো পুনর্যাপন করত এবং সেইসঙ্গে প্রকৃতির মৃত্যু ও পুনর্জন্ম উদ্‌যাপন করত। একচোটে পুরনো প্রথাগুলো খ্রীষ্টীয় ভাবধারাপুষ্ট হয়েছে এবং খ্রীষ্টীয় পালা-পার্বণগুলো লোকাচারে পরিণত হয়েছে।

[১১০] ছয় শতাব্দী ধরে খ্রীষ্টমণ্ডলীতে পুনর্মিলন সংস্কার উদযাপনের ক্রমবিবর্তন

ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টমণ্ডলীর বিধিসম্মত প্রায়শ্চিত্তের চল উঠে যায়। আইরিশ নির্জনবাসী সন্ন্যাসীগণ এই মর্মে সুপারিশ করেছিলেন যে, খ্রীষ্টানদের উচিত তাদের মঠের প্রচলিত প্রথা অর্থাৎ নির্ধারিত প্রায়শ্চিত্তের অবলম্বন করা। প্রায়শ্চিত্তের বিধানপুস্তক প্রতিটি দোষ-অপরাধের যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত নির্দেশ করে। জীবনে একাধিক উপলক্ষ্যে এর সুযোগ গ্রহণ করা যেত।

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর কিছু নির্ধারিত প্রায়শ্চিত্ত

"আমারা সুপারিশ করছি যে, প্রত্যেক যাজকই যেন এখানে যে সকল নির্ধারিত প্রায়শ্চিত্তের বিষয় ভাল মত শিখেন ও প্রত্যেক অনুতাপীর লিঙ্গ, বয়স, সামাজিক অবস্থান, অবস্থা ও ব্যক্তিত্ব বুঝে সতর্কতার সাথে বিচার-বিবেচনা করেন। তিনি অন্তরের আবেগ-অনুভূতিগুলো বিবেচনায় আনবেন এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী তা বিচার করবেন ... যে কেউ কোন সন্ন্যাসী বা যাজককে হত্যা করবে, সে সামরিক কর্তব্য পরিত্যাগ ক'রে ঈশ্বর সেবায় আত্মনিয়োগ করবে কিংবা সাত বছর প্রায়শ্চিত্ত করবে। যে কেউ ঘৃণাবশতঃ বা ধনসম্পত্তির লোভে কোন সাধারণ মানুষকে হত্যা করবে, সে চার বছর প্রায়শ্চিত্ত করবে। যুদ্ধকালে কোন সৈনিক মানুষ খুন করলে চল্লিশ দিন উপবাস করবে। যে মা তার গর্ভধারণের চল্লিশ দিনের মধ্যে তার গর্ভের শিশুকে হত্যা করবে, সে এক বছর উপবাস করবে; যদি চল্লিশ দিন পর হত্যা করা হয়, তাহলে তিন বছর উপবাস করবে। তবে তার সন্তানকে ঠিকমত খাওয়াতে-পরাতে পারে না এমন কোন দরিদ্র স্ত্রীলোকের ও লম্পটের সন্তান হত্যা করার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে ... যে কেউ মাতাল হয়ে বমি করে দেয়, সে চল্লিশ দিন উপবাস করবে যদি তিনি যাজক বা পরিসেবক হন; ত্রিশ দিন উপবাস করবে যদি সন্ন্যাসব্রতী হন; বারো দিন উপবাস করবে যদি খ্রীষ্টভক্ত সাধারণ হন।"

Penitential of Bede (গ্রেট ব্রিটেন)

সাম্য নির্দেশিকা

একটি খ্রীষ্টযাগ তিনদিন উপবাসের সমান ... রাতের বেলায় ছেষট্টিটি সামসঙ্গীত আবৃতির সঙ্গে তিনশ' বার মাথা নোয়ানো দুই দিন উপবাসের সমান। একশ' কুড়িটি খ্রীষ্টযাগের সাথে তিনশ' সামসঙ্গীত প্রার্থনা ও তিনশ' বার মাথা নোয়ানো একশ' স্বর্ণমুদ্রার সমান ...

শক্তিশালী মানুষ বারোজন লোক নেবে যারা তার পরিবর্তে শুধুমাত্র রুটি, জল ও কাঁচা শাক-সব্জী খেয়ে তিনদিন উপবাস করবে। এরপর সে সত্তরগুণ একশ' বিশ জন খোঁজ করবে যাদের প্রত্যেকে তার পরিবর্তে তিনদিন উপবাস করবে। এভাবে উপবাস করলে তা সাত বছরের সমান দিন উপবাস করা হবে।

সপ্তম, অষ্টম এবং দশম শতাব্দীর প্রায়শ্চিত্তসমূহ।

তীর্থযাত্রা ছিল একটি বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত। তাই জেরুসালেমে তীর্থযাত্রা ক্রুসেডে পরিণত হয়েছিল। ক্রুশেডে অংশগ্রহণে এমন প্রায়শ্চিত্তমূলক দণ্ডমোচন যুক্ত ছিল যা মৃত ব্যক্তির বেলায়ও প্রযোজ্য হত।

নির্ধারিত প্রায়শ্চিত্তের সংস্কার অনুষ্ঠান অর্থপূর্ণতা কমে গেলে পাপস্বীকার অর্থাৎ নিজের পাপ স্বীকার করা, প্রথম স্থান লাভ করে।

একাদশ শতাব্দীর রকমারী পাপস্বীকার

"আমাদেরকে অবশ্যই সর্বশ্রেণীর যাজকমণ্ডলীর ব্যক্তির নিকট আমাদের গোপন পাপস্বীকার করতে হবে। প্রকাশ্য দোষ-অপরাধের বিষয়ে বলতে হয়, এগুলো শুধুমাত্র যাজকদের নিকটে স্বীকার করা ভাল, কারণ খ্রীষ্টমণ্ডলী মানুষের ক্রিয়াকলাপ জেনে ও এর জানাজানি বিবেচনা ক'রে তা ধরে রাখে বা মুক্ত করে।

যদি আপনার পাপস্বীকারের জন্য কোন যাজককে না পান, তাহলে আপনার এলাকার কোন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিকে বেছে নিন ... যাজকের অনুপস্থিতিতে কোন সাধু পুরুষ কোন অপরাধী ব্যক্তিকে পরিশোধন করতে পারেন ....

যদি নিজের পাপস্বীকার করতে কোন ব্যক্তি কাউকেই খুঁজে না পায়, তাহলে তার নিরাশ হওয়া উচিত হবে না, কেননা মণ্ডলীর আদি পিতৃগণ, যথা – জন খ্রীসোষ্টম কাসিয়ান, আম্ব্রোজ প্রমুখ এই মর্মে একমত যে, ঈশ্বরের নিকট পাপস্বীকার করাই যথেষ্ট ...।"

লানফ্রাঙ্ক, ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপ
(১০০৫-১০৮৯ খ্রী:)

→

২। দৈনন্দিন জীবন

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টমণ্ডলী তার ঐশতাত্ত্বিক শিক্ষাকে সপ্ত সংস্কারকেন্দ্রিক ক'রে তুলে এবং প্রায়ই কষ্ট হলেও একটা সার্বজনীন নিয়ম-শৃঙ্খলা চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে যার কিছু কিছু নজির আজও টিকে আছে।

দীক্ষাস্নান

প্রায় সর্বত্রই জন্মের কয়েকদিনের মধ্যেই শিশুদের দীক্ষাস্নাত করা হত – শুধুমাত্র পুনরুত্থান বা পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনেই নয়, যেমনটা আগে করা হত। জলে নিমজ্জিত করে দীক্ষাস্নান প্রদানের প্রথার স্থান দখল করে নেয় জল ঢেলে দীক্ষাস্নান অর্থাৎ মাথায় জল ঢেলে এখন আমরা যে প্রথায় দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠান করে থাকি তা ক্রমান্বয়ে প্রচলিত হয়। আগে যেমনটা করা হত এ সময় থেকে নবজাতককে দ্রাক্ষারসসহ কম্যুনিয়ন আর প্রদান করা হত না, কেননা পাশ্চাত্যে খ্রীষ্টযাগ থেকে সাধারণ খ্রীষ্টভক্তদের জন্য এ প্রথাটি বাদ দেয়া হয়েছিল। দীক্ষাস্নান এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, জন্মের সময় মৃত শিশুদেরও সময় সময় বিশেষ গীর্জায় নেয়া হত। কথিত আছে, সেখানে নিলে তারা দীক্ষাস্নান গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য নাকি প্রাণ ফিরে পেত।

পাপস্বীকার ও পবিত্র কম্যুনিয়ন

শেষ বিচার। একটি দৃশ্য শিল্পকর্ম

১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ লাতেরান মহাসভা খ্রীষ্টানদের উপর বছরে অন্তত: একবার পুনরুত্থানকালে নিজ নিজ ধর্মপল্লীতে তাদের পাপস্বীকার ক'রে পবিত্র কম্যুনিয়ন গ্রহণ করার নৈতিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। পাপস্বীকার/পাপ মার্জনা-সংস্কারের ক্রমবিকাশ সমাপ্ত হয় এবং এই সময় থেকে তা 'পাপস্বীকার' নামে পরিচিতি লাভ করে। [১১০]

এমন কি অতি উৎসাহী ব্যক্তিরাও বছরে দু' কি তিনবার পবিত্র কম্যুনিয়ন গ্রহণ করত। তাঁর প্রবল ধর্মানুরাগ সত্ত্বেও সাধু লুইস জীবনে মাত্র ছয়বার পবিত্র কম্যুনিয়ন গ্রহণ করেছিলেন। আমরা হয়তো বলতে পারি এটা খ্রীষ্টপ্রসাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধেরই লক্ষণ, কিন্তু এটা এই সংস্কার সম্বন্ধে সংকীর্ণ ধারণার চিহ্নও বটে। তখন খ্রীষ্টযাগ হয়ে উঠেছিল একটি ভাবগম্ভীর ও রহস্যময় জাঁকজমকপূর্ণ প্রদর্শনীস্বরূপ। এমনি কম্যুনিয়ন গ্রহণ করার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল পুণ্য সংস্কারটির প্রদর্শনী দেখা – এর অতি গুরুত্ব আরোপিত হয় পবিত্র রুটিকা ও পাত্র উত্তোলন করা, পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা এবং খ্রীষ্টদেহের পার্বণ। শেষোক্ত পার্বণটির প্রচলন হয় ত্রয়োদশ শতাব্দী

দ্বাদশ শতাব্দীতে পাপস্বীকার, অনুতাপ ও পুরোহিত কর্তৃক পাপ-মার্জনার মধ্যে ক্রমান্বয়ে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

"কোন যাজকের নিকট অবশ্যই মারাত্মক পাপ স্বীকার করতে হবে এবং বিস্তারিত ভাবেই করতে হবে, কারণ একমাত্র তাঁরই পাপ ক্ষমা করার ও ধরে রাখার ক্ষমতা রয়েছে ... অন্য কারও কাছে পাপস্বীকার করলে পাপ-মার্জনা হবে না। আমরা পাপমুক্ত হই আত্মাবমাননা ও আমাদের ভাই-মানুষদের প্রার্থনার দ্বারা। আর তাই এ ক্ষেত্রে আমরা বলি না, 'আমি তোমার পাপ ক্ষমা করছি' (পাপ-মোচনের সূত্রের আদি নমুনা), কিন্তু মাত্র বলি, 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমার প্রতি সদয় হোন।' "

বাধ্যতামূলক পাপস্বীকার ও বাৎসরিক কম্যুনিয়ন ঃ লাতেরান মহাসভা (১২১৫ খ্রীঃ)

"নারী-পুরুষ উভয় লিঙ্গের বিশ্বাসীবর্গ যাদের সঠিকভাবে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করার বয়স হয়েছে, তারা অবশ্যই তাদের পাল-পুরোহিতের কাছে বছরে অন্ততঃ একবার অকপটভাবে তাদের সমস্ত পাপ স্বীকার করবে, যতটা পারা যায় সাধ্যানুসারে। তার উপর যে দণ্ড/প্রায়শ্চিত্ত আরোপ করা হবে, তা সম্পন্ন করবে এবং পুনরুত্থানকালে ভক্তি সহকারে পবিত্র খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার গ্রহণ করবে। ব্যতিক্রম হবে যখন কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে তার ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত পরামর্শ দেন তার আপাততঃ খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। যে ব্যক্তি এ নির্দেশ অমান্য করে তার বেঁচে থাকলে তার জন্য গীর্জাঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হবে এবং মারা গেলে মণ্ডলী কর্তৃক সমাহিত হবে না।"

থেকে। পুণ্য রুটিকা দর্শনের জন্য বিশেষ পুণ্য গুণ থাকা আরোপ করা হত, যথা – প্রার্থনা আপনাআপনি পূর্ণ হবে এবং যাত্রাপথে আকস্মিক মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এটা যাদুটোনা থেকে খুব একটা দূরের কিছু ছিল না। পুণ্য রুটিকা প্রেমের তাবিজ-কবচ ও ভাল ফসলের সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতিরূপে কাজ করতে পারত। রক্তাক্ত রুটিকাগুলো ছিল আমন্ত্রণকারীদের প্রতি ঐশী প্রত্যুত্তরস্বরূপ।

বিবাহ

মধ্যযুগের প্রথম দিকে বিবাহ বিষয়ক ধর্মতত্ত্ব সুস্পষ্ট ছিল না। তখন এ বিষয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা ছিল যে, কি কি ঐতিহ্যের অংশ ও কি কি খ্রীষ্টমণ্ডলীর দায়িত্ব। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে বিবাহকে সুস্পষ্টভাবে সপ্ত সংস্কারের একটি বলে সুনির্দিষ্ট করার ফলে তা খ্রীষ্টমণ্ডলীর সম্পূর্ণ অধিকারে এসেছিল। আর মণ্ডলী সিদ্ধ বিবাহের বাধা ও শর্তাবলীও নির্ধারণ করেছিল। বিবাহে স্বাধীন সম্মতিজ্ঞাপন হয়ে উঠেছিল বিবাহের অত্যাবশ্যকীয় মাপকাঠি। প্রায়শঃ বিবাহের অত্যন্ত চমৎকার উপাসনিক প্রার্থনাদি অঞ্চলভেদে পরিবর্তিত হত। তবে তা ল্যাটিন ভাষায় বলা হত বলে যারা বিবাহ করতে যেত, তাদের কাছে তা বোধগম্য হত না। সবচেয়ে বড় কথা ছিল – বিয়ের জন্য গীর্জায় যেতে হত যাতে বিয়ের পর তা ধূমধাম ক'রে উদ্‌যাপন করা যায়।

বিশ্বাসে বৃদ্ধিলাভ ও তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়া

এই সময় ধর্মসারবলতে কিছু ছিল না। ভক্তসমাজই আচার-ব্যবহার ও শিক্ষা ধীরে ধীরে অন্যদের কাছে পৌঁছে দিত। পিতামাতা ও ধর্মপিতামাতাদের কর্তব্য ছিল ছোট ছেলেমেয়েদেরকে প্রভুর প্রার্থনা ও দশ আজ্ঞা শেখানো। সাত সংখ্যাটি ধর্মীয় শিক্ষায় স্মৃতিসহায়ক একটি সংখ্যা হিসাবে কাজ করত, যেমন – ৭টি মারাত্মক পাপ, ৭টি প্রধান পুণ্যগুণ, পবিত্র আত্মার ৭টি দান, প্রভুর প্রার্থনার ৭টি অনুনয়, ৭টি পুণ্য সংস্কার ইত্যাদি ইত্যাদি।

রবিবার ও পর্বদিনগুলোতে দেয়া ধর্মোপদেশের মূল উদ্দেশ্য ছিল – ছোট ও বৃদ্ধদের শিক্ষাদান করা। ত্রয়োদশ শতাব্দীটা মঙ্গলবার্তা প্রচারের জোরালো প্রচেষ্টার সাক্ষ্য বহন করেছে। যাঁরা বাণীপ্রচার করতেন, তাঁরা অপেক্ষাকৃত গ্রহণোপযোগী এবং সাধারণ মানুষের ভাষা ব্যবহারে বেশী আগ্রহী ছিলেন। এ ক্ষেত্রে আমরা ভিক্ষু ধর্মসংঘসমূহের প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করি। ডমিনিকের শিষ্যগণ বাণীপ্রচারকের নামধারণ করেন। ভ্রান্ত মতবাদীরা তখন সহজ-সরল ভাষা ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত করেছিল। তাদেরকে ঠেকাতে তাদের অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। গির্জার বাণীমঞ্চটি যজ্ঞবেদীর কাছাকাছি অবস্থান থেকে সরে গীর্জার মধ্য অংশে লোকদের মধ্যে সেখানে নেমে আসে। কোন কোন গীর্জায় বিপুল জনসমাগম হয় এমন সব দিনের জন্য গীর্জার বাইরেও বাণীমঞ্চের ব্যবস্থা থাকত। ডমিনিক এমন কি মিলের কাছাকাছিও বাণী প্রচার করতেন। বাণীপ্রচারকগণ দৈনন্দিন জীবন থেকে নেয়া অনেক দৃষ্টান্ত তাঁদের প্রচারে ব্যবহার করতেন। যারা বণীপ্রচার শুনত তারা যা ভাবত তা-ই প্রকাশ করত, প্রশ্ন করত, ভূয়সী প্রশংসা করত কিংবা ধর্মোপদেশ চলাকালে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করত। বাণীপ্রচারের সময় কেউ ঘুমিয়ে পড়লে বা উপদেশ আরম্ভ হবার আগেই কেউ গীর্জা থেকে চলে গেলে, এমন কাউকে বাণীপ্রচারক জিজ্ঞাসাবাদ করতে ছাড়তেন না।

৩। ধর্মীয় ও জাগতিক

মধ্যযুগের বিশেষত্ব ছিল – মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের সর্বত্র উপস্থিতি, জাগতিক ও ধর্মীয় ভাবধারা সংমিশ্রণ। ধর্মীয় স্থান ও কালের দৈনন্দিন জীবনধারা স্বাভাবিকভাবে মিশে গিয়েছিল। আজকের দিনের মত তখন প্রাত্যহিক জীবন ও ধর্মের মাঝখানে দেয়াল তুলে ধর্মকে আলাদা করে রাখা হয়নি।

গীর্জাঘর – সর্বসাধারণের গৃহ

গীর্জাঘর ও ক্যাথেড্রালগুলো ছিল সর্বসাধারণের স্থান এবং তা উপাসনা ভক্তগণ ছাড়াও আরও অনেক কাজে ব্যবহার করা হত। জনসাধারণ যুদ্ধকালে এ সকল স্থানে আশ্রয় নিত – অনেক সময় তাদের ঘরে আসবাবপত্র ও গবাদি পশু নিয়েও থাকত। কিছু কিছু লোক আসলেই পুণ্য স্থানে বাস করতেন। যেহেতু উক্ত স্থানগুলোতে কোন চেয়ার বা বেঞ্চ

থাকত না, তাই ভক্তমণ্ডলী শীতকালে শুকনো খড় আর গ্রীষ্মকালে নতুন ঘাসের উপর উপবেশন করত। সাপ্তাহিক খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণ একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা ছিল বটে, কিন্তু তাতে যোগদান করা প্রায়ই অনিশ্চিত ছিল। কিছু কিছু মানুষ সাধারণ পানশালায় অপেক্ষা ক'রে উৎসর্গের সময়ই মাত্র গীর্জাঘরে প্রবেশ করত। অন্যেরা উৎসর্গের ঠিক পরপরই গীর্জা থেকে চলে যেত। গির্জায় গিয়ে লোকেরা গল্প-গুজব করত, উপদেশ চলাকালে বাইরে বেরিয়ে আসত, তাদের মনের মানুষদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ গ্রহণ করত ইত্যাদি, ইত্যাদি।

জনপ্রিয় পার্বণসমূহ

উপাসনা বর্ষের মধ্যে উৎপত্তি ও তাৎপর্য সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না এমন সব প্রথার সঙ্গে আমরা যাকে সত্যিকার ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান বলে জানি, তার সংমিশ্রণ লক্ষ্য ক'রে আমরা অবাক না হয়ে পারি না। তখনকার দিনে খ্রীষ্টীয় জগতের বিভিন্ন এলাকা নির্ভর তখনকার দিনে বহু বিচিত্র প্রথা বিদ্যমান ছিল। বড়দিনের পূর্বসন্ধ্যায় বা রাতে কাঠ কিছুটা পুড়িয়ে রাখা হত যেন তা বিষাদের দিনগুলোতে পুনরায় জ্বালানো যায়। নিষ্পাপ শিশু হত্যা দিবসে (২৮শে ডিসেম্বর) ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গীর্জায় পদমর্যাদার স্থান দখল করত; তখন সব উলট-পালট হয়ে গিয়ে ভাঁড়ামিতে পর্যবসিত হত। ১লা জানুয়ারী তারিখে প্রায়শঃ নির্বোধদের পার্বণ পালিত হত ঃ এ সময় গির্জার প্রাঙ্গণে নাচ-গান ও গীর্জার ভিতরে তাস খেলা চলত। এদিন নির্বোধ বা বোকাদের মধ্য থেকে একজন বিশপ ও একজন পোপ নির্বাচিত হত। আর অনুযাজক ও উপ-যাজকগণ তখন যজ্ঞবেদীতে সসেজ এবং রক্ত, কিডনির চর্বি ও বার্লি দিয়ে তৈরী কেক খেতেন ... মাঝে-মধ্যে ধর্মপালগণ এ পার্বণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করতেন বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক দিন ধরে এই পার্বণ প্রচলিত ছিল। এ কালে গর্দভদের পার্বণ বলেও একটি উৎসব ছিল যখন গীর্জায় বলোয়মের গাধার উৎসব হত। রেইম্‌স্‌-এ ভস্ম বুধবারের আগের দিন ট্রেনেব্রেইতে প্রাহরিক প্রার্থনার পর মহামন্দিরের সভাসদগণ শোভাযাত্রায় বের হতেন। শোভাযাত্রাকালে তাঁদের প্রত্যেকের পেছনে এক টুকরা সুতায় বাধা থাকত হেরিং নামক এক প্রকার সামুদ্রিক মাছ যাকে তাঁরা টেনে নিয়ে যেতেন। প্রত্যেক সভাসদ তাঁর সামনের সভাসদের হেরিংটা পায়ে মাড়াতে চেষ্টা করতেন বলে প্রত্যেকেই নিজের হেরিংটা রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকতেন। প্রচলিত প্রথার মধ্যে আরও অনেক ছিল। যাজক সম্প্রদায়ের বিরোধিতা সত্ত্বেও এগুলোর কিছুটা আজও টিকে আছে।

পুণ্যকে ছোঁয়া

পুণ্য ব্যক্তি বা বস্তুকে স্পর্শ করা খ্রীষ্টবিশ্বাসীর বড় আকাঙ্খা ; সময় সময় এটা ছিল খ্রীষ্টের মানবত্বের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধারই ফলশ্রুতি। যীশু খ্রীষ্ট ও সাধু-সাধ্বীগণ যে যে স্থানে বসবাস করতেন, সে সমস্ত স্থান তীর্থযাত্রী ও ধর্মযোদ্ধাগণ দেখতে ও স্পর্শ করতে আগ্রহী ছিলেন। আসিসির সাধু ফ্রান্সিস বড়দিনের একটি সত্যিকার জীবন্ত গোশালাসহ বড়দিন পালন করতেন। পবিত্র ব্যক্তি বা বস্তুর স্পর্শ লাভের এই যে তীব্র বাসনা – এতে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কেন সাধু ব্যক্তিদের স্মৃতিচিহ্নের প্রতি ভক্তির অমন অসাধারণ ক্রমবিকাশ ঘটেছিল। উক্ত স্মৃতিচিহ্নগুলো ছোট ছোট টুকরা [১১১]
ক'রে কেটে দেদারসে ক্রয়-বিক্রয় হত। যীশুর ক্রুশে গাঁথা একটি পবিত্র পেরেকের প্রতি সাধু লুইসের প্রবল ভক্তি ছিল। তিনি প্রাচ্যদেশে প্রভু যীশুর কাঁটার মুকুটটি লাভ করেছিলেন। একটি অনুপম রক্ষা-পেটিকাস্বরূপ এটাকে সংরক্ষণের জন্য তিনি প্যারিসের সন্তগণের চ্যাপেল নির্মাণ করান। অতি বিখ্যাত পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া না গেলে লোকে সব সময় স্থানীয় এমন কোন সাধু ব্যক্তির স্মৃতিচিহ্নকে ভক্তি প্রদর্শন করে যিনি তাদের ফসলের মাঠ ও পশুপাল কিংবা কোন কারিগর সমবায় সংঘকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

দৈনন্দিন জীবনে ধর্মবিশ্বাসের জীবন কিভাবে যাপিত হত

খ্রীষ্টীয় জীবনকে যথার্থভাবে তুলে ধরার জন্য ধর্মীয় প্রথা ও উৎসবগুলোই কি যথেষ্ট ? শুধুমাত্র পূজার্চনা করেন বলেই যে তারা খ্রীষ্টান – আজকের দিনের খ্রীষ্টানগণ নিজেদের এই পরিচয় দিতে পছন্দ করেন না। মধ্যযুগের নৈতিক আচরণের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি ছিল ? নিয়ম হিসেবে যা সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং বাস্তব ক্ষেত্রে যেভাবে জীবন যাপিত হত – এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করতে ঐতিহাসিকগণ আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। ঐশতত্ত্ববিদগণ, বাণী প্রচারকগণ, ধর্মপালগণের ধর্মসভার সংবিধি এবং বিভিন্ন মহাসভা বিপুল সংখ্যক নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করেছে।

নিয়ম-কানুন সবই যে মানুষ মেনে চলত, তা কিন্তু নয়। যাজকগণ এক অনমনীয় যৌন নৈতিকতার কথা প্রচার করতেন, কিন্তু বাস্তবে যথেষ্ট শিথিলতা লক্ষ্য করা যেত এমন কি যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যেও। জনমত প্রায়ই লাম্পট্যের চেয়ে লোভ-লালসাকে অপেক্ষাকৃত কঠোরভাবে বিচার করত।

সাধারণ খ্রীষ্টভক্তগণ তাদের বিশ্বাসের কথা তুলে ধরেছেন, এমন ধরনের দলিলপত্র খুব বেশী পাওয়া যায় না। বিভিন্ন উইলে অন্ততঃ তাদের ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে আমরা সামান্য ধারণা পাই যাদের উইলের মারফত কাউকে দান করার মত অস্থাবর সম্পত্তি ছিল। উইলকারীদের তখন তাদের মৃত্যুর পর সুন্দর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজনে ও তাদের আত্মার চিরশান্তি কামনায় খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গের ব্যাপারে বেশী উদ্বেগ ছিল। সেই সঙ্গে তারা গরীবদের প্রতিও একটা উদ্বেগ প্রদর্শন ক'রে গেছেন। বস্তুতঃপক্ষে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তখনও পর্যন্ত দরিদ্র জনসাধারণ ও ভবঘুরে মানুষেরা সর্বসাধারণের জন্য উপদ্রবজনক ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হয়নি। তাদেরই মধ্যে জীবন্ত প্রকৃত খ্রীষ্টকে দেখা হত। ভিক্ষাদান করার মানে ছিল নিজের জন্য আশীর্বাদ সঞ্চয় করা ও তাদের হয়ে অনুনয়-প্রার্থনা করার লোক পাওয়া। অনেক উইলকারী মৃত্যুর আগে এই বলে অনুরোধ করে যেতেন যাতে তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিনে গরীবদের খাদ্য ও অর্থ প্রদান করা হয়। তাদের কেউ কেউ অনুরূপভাবে সেবাদান ও কুষ্ঠ হাসপাতালের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থ রেখে যেতেন। হাসপাতাল বলতে তখন অভাবী ও গরীব পথচারীদের মধ্যে যারা অসুস্থ হয়ে পড়ত, তাদের জন্য ১০/১২টি খাটের একটি ছোট প্রতিষ্ঠানের চেয়ে প্রায়ই বেশী কিছু ছিল না। শেষোক্ত গরীব পথচারীগণ ছিলেন তীর্থযাত্রী – যারা বিপুল সংখ্যায় ইউরোপের পথে পথে ভ্রমণ করতেন। নিঃসন্দেহে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পেছনে কিছুটা অহমিকা কাজ করত কেননা তা মৃত ব্যক্তির স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবে।

[১১১] সাধু ব্যক্তির স্মৃতিচিহ্ন আবিষ্কার

রাল্ফ গ্লাবের নামে একজন অস্থিরমতি নির্জনবাসী সন্ন্যাসীর 'ঘটনা-বিবরণ' নামক রচনাটি তাঁর সময়কার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের অন্যতম।

"যেমনটা আগেই বলেছি, যখন সমগ্র পৃথিবী নতুন নতুন গীর্জার উজ্জ্বলতায় শোভা পাচ্ছিল, তখন মুক্তিদাতার দেহধারণের সহস্রাব্দের অষ্টম বর্ষে একটি সময় এল। তখন বিভিন্ন নিদর্শন থেকে এমন কতকগুলো স্থানে সাধু ব্যক্তিদের অসংখ্য স্মৃতিচিহ্ন আবিষ্কার করা সম্ভব হল যেখানে সেগুলো দীর্ঘকাল লুকায়িত ছিল। সেগুলো যেন অনেকটা কোন মহিমময় পুনরুজ্জীবনের জন্য অপেক্ষমান ছিল। তাই ঈশ্বরের এক চিহ্নে সেগুলো বিশ্বাসীবর্গের চিন্তা-ধ্যানের জন্য তুলে ধরা হয় এবং তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে মহাসান্ত্বনা। এটা অবিদিত যে, এ সমস্ত আবিষ্কারের প্রথম সূচনা হয়েছিল সেন্‌স-এর গলদের একটি শহরে অবস্থিত ধন্য সাক্ষ্যমর স্তেফানের গীর্জায়। সেই সময় উক্ত শহরের মহাধর্মপাল ছিলেন লিয়েরি। তিনি সেখানে সুপ্রাচীন ধর্মভক্তির কিছু সামগ্রীর একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার করেন ঃ কথিত আছে, অন্যান্য আবিষ্কারের মধ্যে তিনি মোশীর যষ্ঠির একটি খণ্ড হাতে পেয়েছিলেন। এ সমস্ত আবিষ্কারের কথা প্রচারিত হলে শুধু গল দেশ থেকেই নয়, কিন্তু সমগ্র ইটালি এবং এমন কি সমুদ্রের ওপার থেকেও অসংখ্য বিশ্বাসী মানুষ ছুটে এসেছিলেন; এবং সাধু-সাধ্বীদের অনুনয়ের ফলে পীড়িত মানুষেরা সুস্থ হয়ে ফিরে যাওয়ার ঘটনা বিরল ছিল না। তবে এমনও ঘটে থাকে যে, মানুষের কাছে কোন কিছুর সূচনা ভাল বা উপকারী হলেই তাদের দুষ্ট লোভ অচিরেই উহাকে পাপ করার একটি সুযোগে পরিণত করে। যেমনটা আগেই বলেছি, এই যে শহর যেখানে মানুষ দলে দলে ছুটে এসেছে, তা মানুষের ভক্তিকে পুঁজি ক'রে বিপুল ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেছে, এবং অমন একটি বিরাট উপকারের ফলে এর অধিবাসীরা অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে উঠেছে।"

রাল্ফ গ্লাবের, ঘটনা-বিবরণ, ৩য়, ৬

॥৩ ॥মানুষের বিচারবুদ্ধি ও শিল্পকলার প্রেরণশক্তিস্বরূপ ধর্মবিশ্বাস

১। বিশ্বাসভিত্তিক এক সংস্কৃতি

মঠাশ্রমের ও ধর্মপালগণের শিক্ষালয়

আমরা আগেই দেখেছি, মধ্যযুগের সবচেয়ে শীর্ষ সময়টিতে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রিয়াকলাপ প্রায় পুরোপুরিভাবে মঠাশ্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন মঠ বা আশ্রম প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের এবং খ্রীষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণের সুপ্রাচীন রচনাগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করত। এ অবস্থায় মননশীল অধ্যয়নের লক্ষ্য একমাত্র ধর্মীয় ছিল আর তা ছিল – ধর্মশাস্ত্র ও পরম্পরাগত রচনাবলী পাঠ করা, সে সবের উপর ব্যাখ্যা-ভাষ্য প্রদান করতে সক্ষম হওয়া ও এভাবে মঠাশ্রমের সন্ন্যাসীর আধ্যাত্মিক জীবন পরিপুষ্ট করা। ধর্মপালগণের তাঁদের ক্যাথেড্রাল বা মহামন্দিরের কাছাকাছি একটি ক'রে ছোট শিক্ষালয় থাকত। এখানে যাজকদেরকে মৌলিক শিক্ষাদীক্ষা প্রদান করা হত। শার্লেমেন এ ধরনের অনেক শিক্ষালয় স্থাপনের উৎসাহ প্রদান করে গেছেন। ধর্মপালগণ কোন ঐশতত্ত্ববিদ শিক্ষক বা চ্যান্সেলরের উপর এসব শিক্ষালয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত করতেন। উক্ত শিক্ষক বা চ্যান্সেলর তাঁর সাহায্যকারীদের নিয়োগ করতে পারতেন।

প্রবক্তা ইসাইয়া এবং সাধু মথি। পুরাতন ও নতুন নিয়ম। চার্ট্রেস-এ জানালায় বিভিন্ন রঙিন কাঁচ দিয়ে তৈরী নকশা।

নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজন

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টান সমাজের দ্রুত বিস্তার নতুন নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজন আবশ্যক ক'রে তোলে। গ্রেগরীয় সংস্কার আইন-বিষয়ক অধ্যয়নকে উৎসাহিত করে ঃ রোমীয় আইনে প্রত্যাবর্তন ও মাণ্ডলিক আইনের বিশদ বর্ণনা শুরু হয় বিশেষভাবে বোলনায়। নানা আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন ও বিভিন্ন শহরের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন সামাজিক শ্রেণী বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে প্রবেশ করতে আগ্রহী হয়ে উঠে। মঠাশ্রমের শিক্ষালয়গুলোর গুরুত্ব হারায় বটে কিন্তু বিভিন্ন শহরে স্থাপিত ধর্মপালদের শিক্ষালয়গুলো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। কিন্তু এগুলো আর যথেষ্ট ছিল না। অনেক শিক্ষক স্বাধীনভাবে তাদের নিজস্ব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে, যেমন – প্যারিসে লা মন্তে সেন্ট জেনেভিভ শিক্ষালয়টি যার নাম

[১১২] যুক্তি ও বিশ্বাস

হনোরিয়াস আগস্তদানেসিস হলেন একজন রহস্যাবৃত সন্ন্যাসী। তাঁর অতুনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না যদিও তাঁর নামে অমন একটা ইঙ্গিতই মিলে। সম্ভবতঃ তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রেজেন্সবর্গে বসবাস করতেন। সর্ব বিষয়েই তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও কৌতুহল ছিল। তাঁর বিভিন্ন রচনাবলীর মধ্যে সেই সময়কার বিজ্ঞানের উপর রচিত একটি বিশ্বকোষ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত সত্য ছাড়া আর কোন কর্তৃত্ব নেই; কর্তৃপক্ষ যা আমাদের বিশ্বাস করতে শিক্ষা দেন, যুক্তি তা প্রমাণের মাধ্যমে আমাদের জন্য দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করে। ধর্মশাস্ত্রের সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব যা ঘোষণা করে, প্রমাণভিত্তিক যুক্তি তা প্রমাণ করে; সকল স্বর্গদূত যদিও স্বর্গে অবস্থান করে তবুও মানুষ ও তার সন্তান-সন্ততি সৃষ্ট হতে পারত। কেননা এই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে মানুষেরই জন্য, এবং জগৎ বলতে আমি বুঝি স্বর্গ-পৃথিবী এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুকে। মানুষের নির্বাসন হচ্ছে তারই অজ্ঞতা, তার স্বদেশ হচ্ছে বিজ্ঞান।"

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সবই নানা ধরনের সমস্যা ও সংঘর্ষের সূচনা হয়ে দাঁড়ায়।

বুদ্ধিজীবীদের দাবি

সেই সময় ধর্মপালই মাত্র শিক্ষাদানের লাইসেন্স প্রদানের অধিকার সংরক্ষণ করতেন। ফলে তিনি সহজেই ছাত্র-শিক্ষকদের উপর এবং শিক্ষার বিষয়বস্তুর উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হতেন। তা সত্ত্বেও প্যারিসের ন্যায় শহরগুলোতে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এসে ভিড় করত এবং শিক্ষার ব্যাপারে তারা কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে অনিচ্ছুক ছিল। তা ছাড়া শিক্ষকগণও চাইতেন ধর্মপাল ও তাঁর চ্যান্সেলরের সংকীর্ণমনা অভিভাবকত্বের কবল থেকে মুক্ত হতে। বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্র ও নানা ব্যবসায়ী সংঘ যেভাবে স্বতন্ত্র ছিল তারাও একইভাবে স্বতন্ত্র হতে চেয়েছিলেন। তা ছাড়া সন্ন্যাসজীবনের ঐতিহ্যে সাধু বার্ণার্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে তখনও পর্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড মূলতঃ ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা-ভাষ্য রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে, দ্বাদশ শতাব্দীতে পণ্ডিতদের কাছে নতুন নতুন রচনাবলী সহজলভ্য হয়ে উঠে – দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রীক ভাষা থেকে অ্যারিস্টটলের রচনাবলীর ও আরবী ভাষার
[১১২] বিভিন্ন বই-পুস্তকের অনুবাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবেলার্ডের (১০৭৯–১১৪২ খ্রীঃঅঃ) ন্যায় খ্যাতিমান শিক্ষকগণ একটি উন্নততর ঐশতাত্ত্বিক আলোচনা-পদ্ধতির বিকাশ ঘটান যা যুক্তির সাহায্যে ঐশতাত্ত্বিক সত্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিল। এতে অনেকেই তখন বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন।

[১১৩] পোপ নবম গ্রেগরী (১২৩১ খ্রীঃঅঃ) কর্তৃক প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বীকৃতি দান

"জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্মদাত্রী প্যারিস উজ্জ্বলদীপ্তিতে শোভা পাচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে এখানকার শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার্থীগণ। সেখানে তারা খ্রীষ্টের সেনাবাহিনীর জন্য বিশ্বাসের বর্ম, পবিত্র আত্মার তরবারি ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রাদি প্রস্তুত ক'রে থাকেন।

আমরা শিক্ষাগুরু ও শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা প্রদান করছি যাতে তারা শিক্ষা-পদ্ধতি, শিক্ষা-কোর্সের সময় ও আলাপ-আলোচনা-পদ্ধতি এবং উপযুক্ত ব্যবহার ও পোশাক-আশাক সম্বন্ধে বিচক্ষণ নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করতে পারেন; সেই সঙ্গে তারা যেন স্থির করতে পারেন কারা কারা বক্তৃতা দেবেন, কখন দেবেন, এবং কোন্ কোন্ লেখকের লেখা বেছে নেবেন; থাকা-খাওয়ার চাঁদা কি হবে এবং যারা এসব নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করবে, তাদেরকে বহিষ্কার করতে পারবেন।

যদি কোন কারণে আপনাদের পাওনা বেতন আটকে রাখা হয় কিংবা যদি আপনাদের অপমান করা হয় ও আপনাদের প্রতি গুরুতর কোন অন্যায় করা হয়, তাহলে আপনারা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না পাওয়া পর্যন্ত আপনাদের শিক্ষা-কোর্স স্থগিত রাখতে পারবেন ... ।"

[১১৪] একাদশ শতাব্দীতে রোমান স্থাপত্যকলার সূচনা

"১০০০ সালের পর তৃতীয় বর্ষ এলে আপনি দেখতে পাবেন প্রায় সর্বত্র বিভিন্ন গীর্জা পুনর্নির্মিত হচ্ছে, বিশেষ ক'রে ইটালী ও গল দেশে। যদিও বা গির্জাগুলোর অধিকাংশই সু-নির্মিত ছিল এবং সেগুলোর পুনর্নির্মাণের কোন প্রয়োজন ছিল না, তথাপি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিটি খ্রীষ্টসমাজকে তার প্রতিবেশীদের গীর্জার চেয়ে অধিকতর জাঁকালো ও ব্যয়বহুল গীর্জা নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করে। অবস্থাদৃষ্টে বলা চলে গোটা পৃথিবীটাই যেন তার পুরনো পোশাক-পরিচ্ছদ ছেড়ে, সর্বত্র বিভিন্ন গীর্জারূপ শ্বেতবস্ত্রে পরিধান ক'রে আন্দোলিত হচ্ছিল। সেই সঙ্গে ধর্মপালের অধিকারভুক্ত সমস্ত এলাকার এবং যত রকমের সাধু-সাধ্বীদের নামে উৎসর্গ-করা মঠাশ্রমের প্রায় সমস্ত গীর্জা , এমন কি গ্রামের ছোট ছোট চ্যাপেলগুলোও আরও সুন্দর ক'রে তোলার জন্য বিশ্বাসীবর্গের দ্বারা পুনর্নির্মিত হয়।"

রালফ্ গ্লাবের, ঘটনা বিবরণ, ৩য়, ৪

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি

প্রায় প্রায়ই রক্তাক্ত সংঘর্ষের একটা সময়কাল পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি হয়। প্রথম প্রথম এগুলো ছিল মূলতঃ ছাত্র-শিক্ষকদের বা সময় সময় শুধুই ছাত্রদের সংঘের মত। ক্রমান্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের নিজস্ব শিক্ষা-কোর্স ও প্রশাসন পরিচালনায় স্বাধীনতা লাভ করে। ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারী এবং বিশেষ করে ধর্মপালের এখতিয়ারমুক্ত হয়ে সরাসরি পোপের এখতিয়ারভুক্ত হয়। ১২৩১ খ্রীষ্টাব্দে পোপ নবম গ্রেগরী আনুষ্ঠানিকভাবে [১১৩]
প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন।

যুক্তি ও বিশ্বাসের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল

মধ্যযুগীয় দর্শনের উৎপত্তি এমনভাবে হল যে, এতে মধ্যযুগীয় যে শিক্ষাদান-পদ্ধতির জন্ম হয়, তাতে টমাস আকুইনাসের (১২২৫-১২৭৪ খ্রীঃঅঃ) মত কয়েকজন মধ্যযুগের শিক্ষাগুরু অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করেন। তখন খ্রীষ্টমণ্ডলী সেই সময়কার কৃষ্টিকে যেভাবে আপন করে নেয়, যার কোন পূর্ব নজীর নেই। টমাস আকুইনাস তাঁর লেখা গ্রন্থে প্রাচীন বিজ্ঞান ও খ্রীষ্টীয় ঐশ প্রত্যাদেশের মধ্যে একটি মিলবিশিষ্ট সমন্বয় তুলে ধরেন। যুক্তিভিত্তিক গবেষণাকে মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্যের সন্ধানে ব্যবহার করা হয় ঃ সেই দর্শনশাস্ত্র, যার মধ্যে বিজ্ঞানও রয়েছে, তাকে ঐশতত্ত্বের সেবক করা হয়।

[১১৫] লা মান্সের অধিবাসীদের তাদের ক্যাথিড্রালের জন্য প্রবল আগ্রহ

ক্যাথিড্রালের ভিতর গায়কদলের জন্য নির্ধারিত অংশটি পুনর্নির্মিত করার পর সকল অধিবাসী সাধু জুলিয়ানের স্মৃতিচিহ্ন আনুষ্ঠানিকভাবে স্থানান্তরের লক্ষ্যে (এপ্রিল, ১২৫৪ খ্রীঃঅঃ) ক্যাথিড্রালটিকে পরিষ্কার ও সুসজ্জিত করার কাজ হাতে নেয়।

"আড়ম্বরপূর্ণভাবে পুনরুত্থান-পর্ব পালন করার পরের দিন ধন্য জুলিয়ানেরগীর্জায় সমগ্র লা মান্স শহর থেকে সকল বয়সের নর-নারীর এক বিশাল জনতা এসে সমবেত হয়। গীর্জাঘরটি পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে কে সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার করতে পারে – এ নিয়ে তারা পাল্লা দিয়ে গীর্জায় বিক্ষিপ্তভাবে থাকা ময়লা, মাটি ও বালি অপসারণ করে। সেখানে যে সমস্ত মহিলা কাজ করছিল, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ছিলেন প্রবীণা। তারা তাদের স্বাভাবিক নারীসুলভ আচরণের কথা ভুলে গিয়ে ও তাদের সুন্দর পোশাকের প্রতি কোন রকম ভ্রূক্ষেপ না করে তাদের পরনের বহুবর্ণের কাপড়ে ক'রে, তাদের পরিহিত রক্তলাল, সবুজ অথবা অন্যান্য উজ্জ্বল রঙের আচ্ছাদনে ক'রে গীর্জাঘরের বাইরে বালি বইয়ে নিয়ে যায়। যারা তাদের জমকালো পরিচ্ছদে ক'রে গীর্জা থেকে বাইরে ময়লা দ্রব্যাদি বইয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তাদের অনেকেই ধূলাবালি দিয়ে তাদের পরনের কাপড়কে ময়লা ক'রে বরং খুশীই ছিল।

অন্যান্য যাদের সঙ্গে ছোট ছোট বাচ্চা ছিল, তারা তাদের কোলে ক'রে বালি বইয়ে নিয়ে গীর্জার বাইরে নিয়ে ফেলে। এরূপ একটি পবিত্র কাজে ছোট ছেলেমেয়েদের প্রশংসনীয় ভূমিকা ছিল যথাযথ। ... তাদের শক্তসমর্থ বড় ভাইয়েরা কাঠের বড় বড় টুকরাগুলো ও পাথরখণ্ডগুলো গির্জার বাইরে নিয়ে যায় ...।

এই কাজে লোকদের মধ্যে এমন উৎসাহ-উদ্দীপনা, এমন বিশ্বাস, এমন প্রবল ভক্তি পরিলক্ষিত হয় যে, যারা তা দেখেছে, তারা এর ভূয়সী প্রশংসায় মুখর হয়, এবং মানুষের মধ্যে অমন স্বতঃস্ফূর্ত সেবাদানের নজির দেখে তাদের আনন্দাশ্রু সংবরণ করতে পারেনি।

উক্ত অধিবাসীরা তাদের অন্তরের রুদ্ধ আলোটাকে বাইরের মানুষদের কাছে প্রকাশ করতেও উদগ্রীব ছিল। তাই তারা এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্দেশ করে যে, প্রতিটি সংঘের সদস্য-সদস্যাগণ প্রত্যেকের সম্পদের সমানুপাতিক আকারবিশিষ্ট মোমবাতি নিয়ে আসবে, এবং তা আনুষ্ঠানিক পার্বণ দিবসে জ্বালাবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আঙুরক্ষেতের মালিক ও মদ্যব্যবসায়ীরা যখন অন্যদের মোমবাতি দেখতে পেল, কেননা তারা অন্যদের মত একই কাজ করেনি, তখন তারা একমত হয়ে বলল, 'অন্যেরা তো অস্থায়ী একটি আলোর ব্যবস্থা করেছে; এসো, আমরা গীর্জাঘরে এমন জানালা তৈরী করি যা ভবিষ্যতে গীর্জাঘর আলোকিত করবে।' তাই তারা একটি পুরো জানালা তৈরী করল যার পাঁচটি বড় গোলাকার নকশা ছিল। নকশাগুলোতে তাদের শিল্প-কৌশল কাজে রত অবস্থা তা চিত্রিত করল'।

২। জনপ্রিয় খ্রীষ্টীয় শিল্পকলা

ধর্মীয় নাটক

খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ তখনও পর্যন্ত জনপ্রিয় ধর্মীয় নাটকের মাধ্যমে তাদের ধর্মবিশ্বাস প্রকাশ করত। ঠিক গীর্জাঘরের ভিতরে নতুবা গীর্জার প্রাঙ্গণে উপাসনিক নাটকগুলোর মাধ্যমে পুরাতন ও নতুন নিয়মের ঘটনাবলী উপস্থাপন। অলৌকিক যাত্রাভিনয়গুলো কুমারী-মারীয়া ও সাধু-সাধ্বীগণের মধ্যস্থতা তুলে ধরত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে থিওফিলাসের অলৌকিক যাত্রাভিনয়ে এমন একজন যাজকের কাহিনী বলা হয়েছে যিনি ধনসম্পদ লাভের জন্য শয়তানের সঙ্গে একটি চুক্তি করে, এবং শেষ পর্যন্ত শয়তানের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কুমারী মারীয়ার আশ্রয় প্রার্থনা করেন। পরবর্তীকালে "অলৌকিক যাত্রা" বা নাটকগুলোতে বাইবেলের বিভিন্ন কাহিনী যেমন – প্রভু যীশুর যাতনাভোগের কাহিনী যুক্ত হলে তা সুদীর্ঘ ও জটিল হয়ে উঠে।

কুমারী ও পুত্র।
ফন্টেনের মঠ
(Côte d'Or)

পাথরের বাইবেল

[১১৪] পাথরে লেখা বাইবেলের বিভিন্ন অংশবিশেষ আজকাল হয়তো আমাদের কাছে খুব একটা সহজলভ্য নয়, কিন্তু মধ্যযুগের শিল্প ও স্থাপত্যকলা আমাদের কাছে অপেক্ষাকৃত পরিচিত। বিভিন্ন মঠ বা আশ্রমে ও ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় সূচিত রোমানেস্ক স্থাপত্যরীতি (অর্থাৎ ইউরোপে রোমান ও গথিক যুগের মধ্যবর্তী সময়কার স্থাপত্যরীতিবিশেষ) একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে
[১১৫] ও দ্বাদশ শতাব্দীতে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। এই স্থাপত্যরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ধনুকাকৃতি ছাদ, খিলানের স্তম্ভে ও স্তম্ভশীর্ষে ভাস্কর্য এবং প্রাচীরচিত্র অন্যতম। ইলে-দ্য-ফ্রান্সে জাত গথিক স্থাপত্যরীতি দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এ সময়কার শহরাঞ্চলের শিল্পকলা ত্রয়োদশ শতাব্দীর স্থায়িত্বের সাক্ষ্য বহন করে। তাছাড়া স্বচ্ছ রংমিশ্রিত কাঁচ এবং মূর্তি ও ভাস্কর্য তৈরীর কৌশলেরও উন্নয়ন সাধিত হয়। ভাস্কর্য, রঙিন কাঁচের জানালা ও প্রাচীরচিত্রের মধ্যে বাইবেলের বিভিন্ন ঘটনাবলী ও ধর্মসারের মূলকথা ছবিতে উপস্থাপিত হয়। এরূপ শিল্পরীতি বাইবেলের অসংখ্য-কাহিনী, বিশ্বাসের বহু রহস্যাবৃত সত্য, বিভিন্ন পুণ্যগুণ ও পাপ-অনাচার বিধৃত করে। শিল্পীরা পাথরের মধ্যে বিশ্বাসী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মানসিক দুঃখ-যন্ত্রণা, যথা – স্বর্গসুখের প্রত্যাশা ও নরকের ভয় চিত্রিত করেন। এছাড়াও শয়তানের সহচর জাদুকরসহ শয়তানকেও তাদের শিল্প কর্মে চিত্রায়িত করেন। পক্ষান্তরে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে শিল্পকলার এমন সংশ্লিষ্টতা আগে আর কখনও দেখা যায়নি ঃ মানুষের কল্পনার ফানুস ও সার্বক্ষণিক চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিল্পের অপূর্ব সমন্বয় ঘটে তা সত্যি সত্যিই ধর্মীয় চরিত্র লাভ করেছিল। আজ আমরা বিভিন্ন ক্যাথিড্রাল গীর্জাগুলোর মধ্যে আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবিকা অর্জনের উপায়-উপকরণ, তাদের অবসর যাপন, পোশাক-পরিচ্ছদের অনেক নিদর্শন খুঁজে পাই।

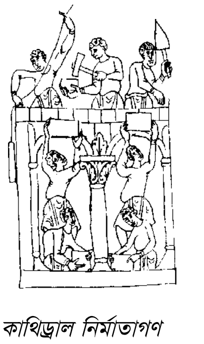

কাথিড্রাল নির্মাতাগণ

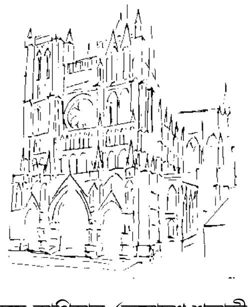

আমিয়েন্সে কাথিড্রাল (ত্রয়োদশ শতাব্দী)

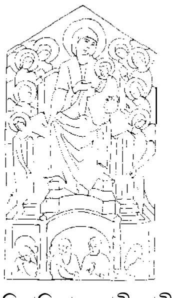

সিমাবু। মহিমান্বিতা কুমারী মারীয়া।
ফ্লোরেন্স (ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ)